উপাখ্যানে উপদেশ

দ্বিতীয়-ভাগ

মহামহোপদেশক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত

[দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক—
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)
বাগবাজার, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান-
শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর
জিলা নদীয়া
এবং গৌড়ীয় মিশনের শাখামঠ-সমূহ

মুদ্রাকর—শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথমসংস্করণে নিবেদন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গৌরপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষট্‌ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথিতে, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৪ই ফাল্গুন তারিখে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমণি পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশ ও উপদেশানুসারে "উপাখ্যানে উপদেশ" প্রথম-ভাগ প্রকাশিত হয়। চারিমাস অতিক্রম হইতে না হইতেই ঐ গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। শ্রীশ্রীবলদেব-প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া **"উপাখ্যানে উপদেশ" দ্বিতীয়-ভাগ** প্রকাশিত হইল। "উপাখ্যানে উপদেশে"র প্রথম-ভাগে লৌকিক উপাখ্যান ও লৌকিক ন্যায়-অবলম্বনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশসমূহ গ্রথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-ভাগে বাস্তব উপাখ্যান অর্থাৎ 'শ্রীউপনিষৎ', 'শ্রীমহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীবিষ্ণুপুরাণ' ও অন্যান্য সাত্বত পুরাণ, 'শ্রীপ্রপন্নামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত,' 'শ্রীনরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ, যাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই গুম্ফিত হইয়াছে।

'উপাখ্যান' বলিতে কেবল যে 'উপন্যাস', কল্পিত বা অবাস্তব ঘটনাপূর্ণ বৃত্তান্তই বুঝায়, তাহা নহে; 'পুরাবৃত্ত'কেও 'উপাখ্যান' বলে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে' বায়ুপুরাণের যে সূতবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও 'উপাখ্যান'-সম্বন্ধে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজ-সত্তমাঃ।
পুরাণ-সংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥

(তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ১৪শ অনুচ্ছেদ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পুরাণার্থবিশারদ শ্রীবেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা—এই কএকটির সন্নিবেশে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—"আখ্যানৈঃ—পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি ; **উপাখ্যানৈঃ—পুরাবৃত্তৈঃ**, গাথাভিঃ—ছন্দোবিশেষৈশ্চ।" ইহা হইতে জানা যায়,—'আখ্যান' অর্থে 'পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট পুরাণ', **'উপাখ্যান'** অর্থে **'পুরাবৃত্ত'**, আর পিতৃপ্রভৃতির গীত—'গাথা'। বস্তুতঃ স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণন,—'আখ্যান'; **শ্রুতবিষয়ের বর্ণন—'উপাখ্যান'**।

এই গ্রন্থে ৩৪টী শাস্ত্রীয় উপাখ্যান ও তন্মূলক-শিক্ষা ও উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে একাধারে শুদ্ধভক্তিময় জীবনের অনুসরণীয় অনবদ্য আদর্শ, লোকোত্তর আচার্য্যগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, উপদেশ ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পুরাণাদি শাস্ত্রের উপাখ্যানসমূহ লোকসমাজে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। "উপাখ্যানে উপদেশে"র দ্বিতীয়-ভাগে পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ বর্ণিত হইলেও সেইরূপ গতানুগতিক লৌকিক বিচার ও মনোধর্ম্মপর সিদ্ধান্তের অনুকরণ তাহাতে নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রমুখ শ্রীরূপানুগবর গৌরজনগণ যে-সকল মৌলিক ও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই শুক-মুখবিগলিত নিগমকল্পতরুর গলিতফলের ন্যায় অধিকতর শক্তিসঞ্চারকারী অনর্থবিধ্বংসী ভক্তি-সিদ্ধান্তোপদেশামৃতরূপে এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত আত্ম-মঙ্গলকামী সাধক এই সকল শ্রৌতবাক্যে শুদ্ধভক্তিময় জীবন-গঠনের বহু উৎকৃষ্ট উপাদান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থ অতি-দ্রুত মুদ্রিত হওয়ায় প্রথম-ভাগের ন্যায় ইহাতে অধিক চিত্র প্রদান করিতে পারা যায় নাই। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বালব্রহ্মচারী শ্রীমান্ যোগমায়াশ্রিতদাসজী উভয় গ্রন্থের চিত্রের পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়াছেন; মহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত, শ্রীপাদ হরিজনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শিবদবাস্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ প্রমুখ কএকজন সতীর্থ ভ্রাতা এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে প্রুফ সংশোধনাদিকার্য্যে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের প্রতিও আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বশেষে যাঁহার অহৈতুক-কৃপাশীর্ব্বাদ, শক্তি-সঞ্চার ও অনুপ্রেরণায় পঙ্গু হইয়াও আমি গিরিলঙ্ঘনকার্য্যে সাহসী হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শিক্ষা ও বর্ত্ম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদ্বয়কে আমার সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি-জ্ঞাপনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের অবঞ্চনাময়ী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণের লভ্যাংশ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের সেবানুকূল্যে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর
বিরহতিথি—১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপাখ্যানে উপদেশ

দ্বিতীয় ভাগ

"বড় আমি" ও "ভাল আমি"

একবার দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। ভগবানের শক্তির প্রভাবেই দেবতারা অসুরগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু দেবতারা ভগবানের কৃপা-শক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাদের স্ব-স্ব বাহুবল ও দক্ষতার গুণেই জয়ী হইয়াছেন,—মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন এবং লোকের প্রদত্ত সম্মান ও জয়মাল্য নিজেরাই আত্মসাৎ করিলেন।

ভগবান্ দেবতাগণের এই অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের দাম্ভিকতা দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে ছদ্মবেশে উপস্থিত

হইলেন। দেবতারা ছদ্মবেশী ভগবান্‌কে সম্মুখে দেখিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না।



তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন,—"আমাদের সম্মুখস্থ এই পূজনীয় পুরুষটি কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জানিয়া আইস।" অগ্নি ঐ মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্নিকে বলিলেন,—"তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন,—"আমি অগ্নি,—আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদাঃ"।

ভগবান্ বলিলেন,—"তোমার কি শক্তি আছে?" অগ্নি উত্তর করিলেন,—"পৃথিবীতে যত কিছু আছে, সকলই আমি এক মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করিতে পারি।" তখন ভগবান্ অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"ইহা দগ্ধ কর।"

অগ্নি সেই তৃণের নিকটে গিয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগবানের নিকট হইতে দেবতাগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটি কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

দেবতারা তখন ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লইবার জন্য বায়ুকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বায়ু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে, ভগবান্ বায়ুকে বলিলেন,—"তুমি কে?" বায়ু বলিলেন,—"আমি মাতরিশ্বা"।

ভগবান্ বলিলেন,—"তোমার কি ক্ষমতা আছে?" বায়ু বলিলেন,—"এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" ভগবান্ তখন বায়ুর নিকটে একটি তৃণ রাখিয়া বায়ুকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। বায়ু তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণটিকে এক চুলও নড়াইতে পারিলেন না। বায়ু তখন দেবতাগণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটি কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

ইহার পর দেবতারা ঐ মহাপুরুষের পরিচয় জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন আকাশে পরম-সুন্দরী উমাদেবীকে আবির্ভূতা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটি কে?" উমাদেবী বলিলেন,—"'ইনিই ব্রহ্ম,' ইঁহার বিজয়েই তোমরা

মহিমান্বিত হইয়াছ, ইঁহার শক্তিতেই তোমাদের শক্তি,—ইনি যখন তাঁহার প্রদত্ত শক্তি প্রত্যাহরণ করেন, তখন তোমাদের কোনই মূল্য থাকে না ; তোমাদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দক্ষতা, বীরত্ব ও পৌরুষের মূল মালিক—একমাত্র পরমব্রহ্ম, তিনিই যন্ত্রী, তোমরা যন্ত্রমাত্র। যখনই তোমরা মনে করিবে যে, তোমাদের শক্তিতেই তোমরা সমস্ত করিতেছ, তখনই ব্রহ্ম তাঁহার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইবেন।"

যাহারা গুরু ও ভগবানের শক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের নিত্যপ্রাপ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে চাহে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাহাদের সমস্ত কার্য্য-দক্ষতা হরণ করিয়া থাকেন। যখন জীব দক্ষতা ও ক্ষমতাকে হরিসেবায় নিযুক্ত করে, তখনই সে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কৃপায় উদ্ভাসিত হয়। আর যখনই উহাদিগকে দাম্ভিকতার পোষণে বা গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষে নিযুক্ত করে, তখনই জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সমস্ত শক্তির মূল আধার একমাত্র পরমেশ্বর ; সুতরাং সমস্ত কনক-কামিনী ও লাভ-পূজা-সম্মানাদি তাঁহারই প্রাপ্য।

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর' নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥"

রাবণ যশের জন্য এতটা লুব্ধ হইয়াছিল যে, সে স্বয়ং রামচন্দ্রের আসন অধিকার করিতে চাহিয়াছিল ! সে ভগবানের

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকেও হটাইয়া দিতে পারে,—এইরূপ অহঙ্কার করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার ভাগ্যে সে সম্মান লাভ হইল না, সে বিনষ্ট হইল। জীব যখন ভগবানের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ম্ম-দক্ষতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, তখন তাহার এইরূপ পুরস্কারই লাভ হয়। অতএব সমস্ত লাভ, পূজা, সম্মান শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া, নিজে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া নিজেকে কৃষ্ণের দাসানুদাস-জ্ঞানে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখিলে পরমেশ্বরের প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার হইতে পারে।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপনিষদের এই আখ্যায়িকাটি কীর্ত্তন করিয়া 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমিই বাহুবলে সব করিতে পারি, এইরূপ দম্ভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'ভাল আমি' অর্থাৎ আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য দাসানুদাস ক্ষুদ্র জীবকীট, তাঁহাদের কৃপাই আমার সম্বল, তাঁহারাই যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র, সর্ব্বদা হৃদয়ে এইরূপ অকপট ভাব পোষণ করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন। স্বতন্ত্রতা ও দাম্ভিকতাই 'বড় আমিত্ব', আর অকপট কৃপাভিলাষের সহিত গুরুবর্গের নিত্য শাসনাধীন থাকিয়া আত্ম-সংশোধনের প্রযত্নই 'ভাল আমিত্ব'।

ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন

এক সময়ে ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, "আত্মা পাপ পুণ্য, জরা, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা, সঙ্কল্প ও বিকল্পের অতীত বস্তু। যিনি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এই আত্মার অনুসন্ধান করেন, তিনিই আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন এবং তিনিই সকল মহিমায় মহিমান্বিত হন; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহার সেবা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।"—ব্রহ্মার এই বাণী লোক-পরম্পরায় দেবতা ও অসুর, উভয়েরই কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"ব্রহ্মা যে আত্মার কথা বলিয়াছেন—যে আত্মার উপলব্ধিতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের দাসত্ব করিবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই আত্মার অনুসন্ধান করিলে ক্ষতি কি?"—এইরূপ বিচার করিয়া দেবতাদিগের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরদিগের মধ্য হইতে বিরোচন ব্রহ্মার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বন্ধু না হইয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদ্যা-লাভ-বিষয়ে পরস্পরের ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা সমিধ্-হস্তে ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুইজনই বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া গুরু-গৃহে অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট বাস করিলেন। ইহার পর

একদিন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এখানে কি জন্য অবস্থান করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন,—"আপনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই আত্মাকে যিনি হৃৎপদ্মে অনুভব করিতে পারেন, সমগ্র ঐশ্বর্য্য তাঁহার অধীন হয়। আমরা আপনার সেই মহতী বাণী শ্রবণ করিয়া সেই অমর আত্মার অনুসন্ধানের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহাযোগিগণ নয়নের মধ্যে যে পুরুষকে অবলোকন করেন, তিনিই সেই আত্মা; তিনিই অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার পর-ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই ব্রহ্মার এই উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্! জলে ও দর্পণাদিতে আমরা আমাদের যে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সেই আত্মা?" ব্রহ্মা, নিজের অভিপ্রায়ানুসারে বলিলেন,—"সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরেই সেই আত্মা পরিদৃষ্ট হন। তোমরা এই জলপূর্ণ-পাত্রে নিজ-নিজ আত্মাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে না পারিবে, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই সেই জলপূর্ণ পাত্র নিবিষ্টচিত্তে অবলোকন করিলেন; কিন্তু কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তখন তাঁহারা বলিলেন,—"ভগবন্! আমরা আত্মাকে ও তাঁহার লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত প্রতিরূপটিকে দেখিতে পাইতেছি।" তখন ব্রহ্মা

তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা তোমাদিগের কেশ-নখাদি ছেদন-পূর্ব্বক দিব্য-বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ-পাত্রে পুনরায় তোমাদিগকে দর্শন কর।" তাঁহারা তাহাই করিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"আমরা যেরূপ কেশ, লোম ও নখগুলিকে ছেদন করিয়া সুন্দর বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়াছি, সেই প্রতিরূপই দেখিতে পাইতেছি।" ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন,—ইঁহারা এখনও প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। হয় ত' কালে উঁহারা তাঁহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,—এই বিচার করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয় ব্রহ্ম।" তখন ইন্দ্র ও বিরোচন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়কে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—উঁহারা উভয়েই আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন। দেবতাই হউক, আর অসুরই হউক, যাহারা উঁহাদের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে মতবাদ গ্রহণ করিবে, তাঁহারাই প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।



অসুরদিগের রাজা বিরোচন শান্ত-হৃদয়ে অসুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে এইরূপ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন,—"এ দেহই আত্মা। জগতে এ দেহই পূজনীয়, দেহেরই সেবা করিতে হইবে; দেহের সেবার দ্বারাই ইহলোক ও পরলোক লাভ হইয়া থাকে।" বিরোচনের এই উপদেশ হইতেই অদ্যাপি এ জগতে দেহাত্মবাদই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—এরূপ কুমতবাদ প্রচারিত আছে। অসুর-প্রকৃতি লোকেরা এরূপ ভ্রান্ত-ধারণায় দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই তাহারা মনে করে,—যদি মৃত ব্যক্তির শবকে গন্ধ, মাল্য ও দিব্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত করা যায়, তবে তদ্দ্বারাই সে পরলোকে সুখী হয়।

এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিবার পথে ব্রহ্মার কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচার করিলেন,—"ব্রহ্মা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে একটি নিগূঢ় কথা আছে। প্রতি-বিম্বটি যে বাস্তব ও নিত্যবস্তু নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অতএব নিত্যবস্তুর সন্ধানের জন্য একান্ত শরণাগত হইয়া পুনরায় তাঁহার বাণী আমার শ্রবণ করা উচিত।"

ইন্দ্র এইরূপ বিচার করিয়া পুনরায় সমিধ হস্তে ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"ওহে ইন্দ্র! এই যে তুমি বিরোচনের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, পুনরায় কি জন্য আগমন করিয়াছ?" ইন্দ্র বলিলেন,—"প্রভো! আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছে যে, লোম

ও নখগুলিকে কাটিয়া এ শরীরকে দিব্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত করিলে যেরূপ জলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ কেহ যদি অন্ধ হয়, বা হস্ত-পদাদি ছেদন করে, কিংবা ব্যাধির প্রবল আক্রমণে তাহার চক্ষু ও নাসা হইতে জল-স্রাব হইতে থাকে, তবে তাহার প্রতিবিম্বও তদনুরূপই দেখাইবে; আবার এই দেহ বিনষ্ট হইলে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইবে; অতএব এই প্রতিবিম্ব বা ছায়াকে জানিয়া আমার কোন লাভ নাই,—ইহা কখনই আত্মা হইতে পারে না।

ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক। পূর্ব্বে আমি তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহাই আবার তোমাকে বলিব; তুমি তাহার তাৎপর্য্য তখন বুঝিতে পার নাই; অতএব আরও বত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া শ্রবণ কর।" ইন্দ্র সেই ব্রত গ্রহণ করিলে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই উপদেশ দিলেন,—"স্বপ্নে যিনি পরিপূজিত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা; তিনিই সর্ব্বভয়-নিবারক অমর আত্মা বা ব্রহ্ম।" ব্রহ্মার নিকট এই উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—"যদি কোন লোক জাগ্রত অবস্থায় অন্ধ থাকিয়া স্বপ্নকালে আপনাকে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া দর্শন করে, তাহা হইলে সেইরূপ প্রতিবিম্ব-দর্শন কি সত্য? অতএব স্বপ্ন-পুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া জানিয়া আমার লাভ কি?" এইরূপ বিচার করিয়া ইন্দ্র পুনরায় সমিধ্-হস্তে ব্রহ্মার

নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিচার জানাইলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে আরও বত্রিশ বৎসর তাহার নিকট বাস করিয়া শ্রবণ করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—"সুষুপ্তিকালে যে আত্মা প্রকাশিত হন, তিনিই সর্ব্বভয়-নিবারক অমর আত্মা বা ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ব্রহ্মার এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে গমন করিলেন; কিন্তু এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় সমিধ্‌হস্তে ব্রহ্মার নিকট আসিলেন এবং গুরুদেবকে নিজের সংশয়ের কথা জানাইয়া বলিলেন,—"সুষুপ্তি-সময়ে যিনি স্ব-মহিমায় প্রদীপ্ত হন, তিনিই যদি আত্মা হইয়া থাকেন, তবে জাগরকালে ও স্বপ্নে আমাদের যে 'আমি' এইরূপ জ্ঞানধারা নিত্য প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা তখন রুদ্ধ হয় কেন? অথচ আপনি বলিয়াছেন যে, আত্মা—সৎস্বরূপ।" ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে আরও পাঁচ বৎসর তাঁহার সমীপে বাস করিয়া শ্রবণ করিতে বলিলেন এবং ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—সেই আত্মা প্রকৃত-প্রস্তাবে 'শরীরী'। পাঞ্চভৌতিক শরীর ও স্বাপ্নিক দেহ, যাহাকে 'লিঙ্গ-শরীর' বলা হয়, উহারা সেই আত্মারই আবরণদ্বয়।"

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।"

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১২।৩

এই জীব মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজের চিন্ময়-অপ্রাকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই উত্তম-পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।

ইন্দ্র সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া গুরুগৃহে বাস ও গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করিতে করিতে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং কৃতকৃতার্থ হইলেন।

উপনিষদের এই আখ্যায়িকাটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সদ্গুরুর নিকট—ব্রহ্মার ন্যায় প্রসিদ্ধ আদি জগদ্গুরুর নিকট আসিয়াও হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকিলে দুইটি শিষ্য দুই ভাবে সদ্গুরুর উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে। অসুরগণের রাজা বিরোচন ব্রহ্মার বাক্যের প্রকৃত-মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গুরুর দোহাই দিয়া গুরুদেবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদকেই গুরু ও শাস্ত্রের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছিল,—বহু অসুর তাহার মতের গ্রাহক হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। আর, দেবতাগণের রাজা ইন্দ্র অসহিষ্ণু না হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রবণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরুদেবের সব কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছি',—এইরূপ বিচার করিয়া অসুর-সমাজের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিলাষী হন নাই। গুরুপাদপদ্মে শরণাগত ও শুশ্রূষু শিষ্যই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সদ্গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবনরূপ সমিধ্ লইয়া আসিবার অভিনয় করিয়াও হৃদয়ে অন্য

অভিলাষ থাকিলে গুরুদেবের বিরুদ্ধ মতেরই প্রচারক হইয়া যাইতে হয়। এক গঙ্গার তটেই আম্র ও নিম্ববৃক্ষ অবস্থান করিয়া এক গঙ্গার জলই পান করিয়া থাকে। কিন্তু আম্রবৃক্ষ সুমিষ্ট-ফল ও নিম্ববৃক্ষ তিক্ত-ফলই প্রসব করে। ইহাতে গঙ্গার জলের কোন দোষ নাই বা গঙ্গার দান-কার্য্যেও কোন কৃপণতা নাই; কিন্তু আধারের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন ফল প্রসূত হইয়া থাকে। তদ্রূপ একই সদ্‌গুরুর নিকট আসিয়াও কেহ যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, আর কেহ বা গুরুদেবের বিরুদ্ধ-মতের প্রচারক হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিকট শ্রীল ঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্রপুরী উভয়েই আসিলেন। উভয়েই তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপা-লাভের অভিনয় করিয়াও রামচন্দ্রপুরী বঞ্চিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক ও শ্রীল ঈশ্বরপুরী যথার্থ কৃপা-প্রাপ্ত অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াছিলেন।

"সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ ৮।২৯-৩০

নচিকেতাঃ

অতি প্রাচীনকালে রাজশ্রবা ঔদ্দালকি স্বর্গলাভের আশায় 'বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ঔদ্দালকির নচিকেতাঃ নামে এক পুত্র ছিলেন। নচিকেতাঃ বালক হইলেও খুব বুদ্ধিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যখন তাঁহার পিতা কতকগুলি অকর্ম্মণ্য গাভীকে (যাহারা দুগ্ধ-দানে ও সন্তান-উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে) দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নচিকেতাঃ মনে মনে বিচার করিলেন,—"যিনি এই অকর্ম্মণ্য গাভীগুলিকে দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই 'অনন্দা'-নামক নিরানন্দলোকে গমন করিবেন।"

নচিকেতাঃ এইরূপ বিচার করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! আপনি কোন্ ব্যক্তির দক্ষিণা-স্বরূপ আমাকে দিবেন?" মহারাজ তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া নচিকেতাঃ পুনরায় পিতাকে সেই প্রশ্নই করিলেন। দ্বিতীয়বারেও কোন উত্তর না পাইয়া নচিকেতাঃ তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করিলে মহারাজ ঔদ্দালকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে যমের নিকট দিব।"

পিতার এই কথা শুনিয়া নচিকেতাঃ একান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমার পিতার যে-সকল পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত

হইবে, আমি তাহাদিগের মধ্যে প্রথম, আর যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—এইরূপ অনেকের মধ্যে মধ্যম। অতএব, আমি প্রথমতঃ বা মধ্যমতঃ যমালয়ে গমন করিতেছি। যমের এমন কি কার্য্য আছে, যাহা পিতা আমাকে দিয়া সাধন করাইবেন ?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া নচিকেতাঃ পিতাকে বলিলেন,—"পূর্ব্ব-পুরুষগণ যেরূপে যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বর্ত্তমান পুরুষেরা যেরূপে যমালয়ে গমন করিতেছেন, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং উহার ন্যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব যমালয়ে গমন করিতে আমার কোনও কষ্ট নাই।"

পিতৃসত্য-পালনের জন্য নচিকেতাঃ যমালয়ে গমন করিলেন। যম তখন গৃহে ছিলেন না, নচিকেতাঃ যমের গৃহে তিন রাত্রি অবস্থান করিলেন। পরে যম গৃহে ফিরিয়া আসিলে যমের পত্নী যমকে বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহে একজন অতিথি অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যম নচিকেতার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার গৃহে অতিথি হইয়া তিন রাত্রি উপবাসী আছ। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। এজন্য তুমি এক একটি রাত্রির জন্য এক একটি বর প্রার্থনা কর।"

তখন নচিকেতাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ, আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত হন এবং আমি যখন আপনার নিকট হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া স্নেহের সহিত সম্ভাষণ করেন।" যম 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন। তখন নচিকেতাঃ বলিলেন,—"স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই; সে-স্থানে আপনি শিক্ষকরূপে অবস্থান না করায় লোকসমূহ ভয়গ্রস্ত হয় না। তথায় লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অভাব নাই, সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। যে অগ্নির সাহায্যে লোকে স্বর্গে গমন ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে সেই অগ্নিবিষয়ক বিজ্ঞান দান করুন,—ইহাই আমার প্রার্থিত দ্বিতীয় বর।"



যমরাজ বলিলেন,—"তুমি যে-অগ্নির কথা বলিতেছ, সে-অগ্নি অনন্ত বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধন ও নিখিল-বিশ্বের আশ্রয়।" যম নচিকেতাকে সেই অগ্নির বিষয় বলিলেন; নচিকেতাঃ যমের উপদেশ অবিকল আবৃত্তি করিলেন। যম তাঁহাকে শিষ্যের উপযুক্ত জানিয়া ও তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত

তিনটী বর ব্যতীত আরও একটি বিশেষ বর প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে অগ্নির বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, সেই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। তখন নচিকেতাঃ বলিলেন,—"কেহ কেহ বলেন—আত্মা আছেন, কেহ বলেন—আত্মা নাই। এ-সম্বন্ধে আমি আপনার উপদেশ ও সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করি।"

যম বলিলেন,—"এ-বিষয়ে পূর্ব্বে দেবতারাও সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। এই বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম; আমাকে এজন্য আর অনুরোধ করিও না। তুমি অন্য যে-কোন বর প্রার্থনা কর—তোমাকে শতায়ুঃ, পুত্র-পৌত্র, বহু গাভী, পশু, হস্তী, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজ্য, স্বর্গ এবং তোমার যত বৎসর ইচ্ছা হয়, তত বৎসরের পরমায়ুঃলাভের বর প্রদান করিতেছি, পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে যে-যে কামনা অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তুমি ইচ্ছানুসারে সেই সকল প্রার্থনা করিতে পার; রূপ-যৌবনসম্পন্না, নানাগুণে অলঙ্কৃতা, বাদ্যযন্ত্র-ধারিণী, রথাদিযুক্তা রমণীসমূহ তুমি প্রার্থনা করিতে পার—তুমি ইহাদের সহিত পরমসুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে; আমি তোমাকে এখনই এই সকল বর দিতেছি। তুমি কেবল মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ, ইহা অতি গোপনীয়।"

যম নচিকেতাকে এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইলেন। নচিকেতাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ! আপনি আমাকে যে-সকল বস্তুর লোভ দেখাইতেছেন, আমি তাহা কিছুই চাহি না। কারণ, ঐগুলি সকলই মৃত্যুর অধীন, কিছুই থাকিবে না। আজ যে-

সকল পুত্র আছে, কালই তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আপনি যদি শত বৎসর, সহস্র বৎসর বা অযুত বৎসর তাহাদের পরমায়ুঃ লাভেরও বর প্রদান করেন, তথাপি উহাদের বিনাশ হইবে। অনন্তকালের তুলনায় অযুত বৎসর কতটুকু, আর পুত্রাদি পালন ও রক্ষণের জন্য সমগ্র ইন্দ্রিয়ের তেজঃ নষ্ট হইয়া যায়, কত শক্তির ক্ষয় হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, কামিনী, পৃথিবী বা স্বর্গের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আপনারই থাকুক, উহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধন-সম্পত্তি মনুষ্যকে কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি যখন আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি, তখন আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও পরমায়ুঃ আনুষঙ্গিক-ভাবেই লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য পৃথক্ প্রার্থনার প্রয়োজন কি? হে যম! আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না,—আমাকে কেবল সেই আত্মার কথা বলুন। দীর্ঘকাল জীবিত থাকাও দুঃখের হেতু; উহা কোন বুদ্ধিমান্ লোকই প্রার্থনা করে না; কারণ, বয়স অধিক হইলে জরা-ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করে, তাহাতে অশান্তি ভিন্ন শান্তি লাভ হয় না। কেহ কেহ ভাগ্যফলে সুস্থ থাকিলেও এই পৃথিবীতে খুব বেশী দিন একভাবে জীবন অতি-বাহিত করিতে পারে না। হে যমরাজ! 'আত্মা আছে কি না,— লোকে যে এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পর-লোক-সম্বন্ধীয় যে বর অতি গোপনীয়, তাহা ব্যতীত অন্য কোন বরই আমি প্রার্থনা করিব না, জানিবেন।"

আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য নচিকেতঃকে এইরূপ একনিষ্ঠ দেখিয়া যমরাজ বলিলেন,—"তুমি 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা আপাত-প্রীতিকর, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা জানিতে উদ্যত হইয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। ভগবানের সেবাই—'শ্রেয়ঃ' বা মঙ্গল, আর স্ত্রী-পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কাম্যবস্তু—প্রেয়ঃ; এই দুইটি পরস্পর পৃথক্। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহারই ভব-বন্ধনের মোচন হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম-প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভব-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটিকে ভালরূপে জানিয়া কোন্‌টির দ্বারা বন্ধন হয় ও কোন্‌টির দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিচার করেন। ধীর ব্যক্তি আপাত-প্রীতিকর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াও পরিণামে যাহা মঙ্গলজনক, সেইরূপ বস্তুকেই বরণ করেন। আর মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যে-সকল জাগতিক বস্তু লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রচেষ্টা এবং যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা করে। তোমাকে কোনপ্রকার প্রেয়ের কামনা লুব্ধ করে নাই দেখিয়া আমি তোমাকে একান্ত ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী জানিলাম। অন্ধ যেরূপ অন্ধকে পথ দেখাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ যে-সকল মনুষ্য অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমন্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে ও পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, সেই-

সকল কুটিলগতি মূঢ়ব্যক্তিও আপাত-প্রীতিকর বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ-নরকাদিতে ভ্রমণ করে, তাহারা অভীষ্টস্থানে যাইতে পারে না, বা কাহাকেও প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। ঐসকল মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পরলোক-প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। ঐসকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পৃথিবী ব্যতীত আর কোন পরলোক ও বাস্তব-সত্য নাই, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার কথা অনেকেরই কর্ণে উপস্থিত হয় না, আবার শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাহাকে অনুভব করিতে পারেন না; কারণ, আত্মতত্ত্ববিৎ উপদেশক বা সদ্‌গুরু অত্যন্ত দুর্লভ। যদিও সেইরূপ গুরু বা উপদেশক কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে লাভও হয়, কিন্তু উহার শ্রোতা বা শিষ্য অত্যন্ত দুর্লভ। হে নচিকেতঃ! ভগ-বানের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে সুদৃঢ়মতি লাভ করিয়াছ, উহাকে শুষ্ক-তর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না। ভগবদ্ভক্তিতে শুষ্কতর্ক আনয়ন করিলে ভক্তিবৃত্তি বিনষ্ট হয়। আমি তোমাকে নানা-ভাবে প্রলুব্ধ ও আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন মনুষ্য কখনও সেই নিত্য-আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যে-ব্যক্তি মহাজনের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও তাহা অবধারণ করেন, তিনিই সেই আনন্দময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার প্রতি বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত

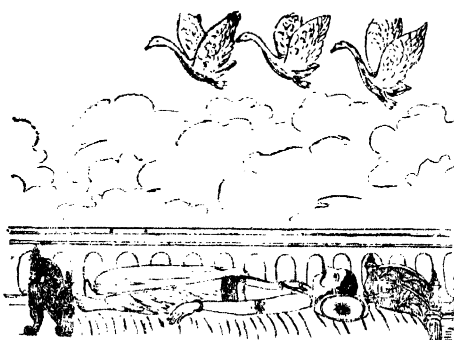
হইয়াছে।” নচিকেতাঃ বলিলেন,—“হে যমরাজ! আমার প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যাঁহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, সেই বস্তুর উপদেশ করুন।”

যমরাজ বলিলেন,—“সমগ্র বেদ যাঁহার স্বরূপ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণ বেদ অধ্যয়ন ও আচার্য্য-সেবারূপ ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত ধারণ করেন, আমি সেই ব্রহ্মের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি,—‘ওঁ’-কেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে; এই অক্ষরই অবিনাশি-ব্রহ্ম এবং ইহাই ‘পরমাক্ষর’ বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহাই সকলের প্রধান ও পরম আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিতে পারিলেই জীব ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের যেরূপ জন্ম-মৃত্যু নাই, তদ্রূপ ভগবান্‌কে যিনি জানেন, সেই জীবাত্মারও জন্ম-মৃত্যু নাই। ভগবৎস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মের নিকট শরণাগতিই জীবের মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়। এই পরমাত্মাকে পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিবলে লাভ করা যায় না, বহু বহু শ্রবণ করিয়াও ইনি উপলব্ধির বিষয় হন না; কিন্তু একান্ত শরণাগত যে-জীবকে সেই পরম বস্তু অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই নিকট সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা নিজতনু প্রকাশ করেন; ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তি।

জানশ্রুতি ও রৈক্ক

'জানশ্রুতি' নামে এক রাজা ছিলেন। 'সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকে তাঁহার অন্ন ভোজন করিবে'—এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

দেবর্ষিগণ সেই দানশীল রাজার গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার উপকার করিবার জন্য একদিন গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কতকগুলি হংসের রূপ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকাল বলিয়া রাজা প্রাসাদের ছাদে শয়ন করিয়াছিলেন। হংসরূপধারী দেবর্ষিগণ রাজার ঠিক্ উপরিভাগে আকাশে উড়িতে লাগিলেন। ঐ হংসশ্রেণীর মধ্যে সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হংসটি সকলের অগ্রবর্ত্তী হংসটীকে ডাকিয়া বলিল,—"তুমি কি জান না, মহারাজ জানশ্রুতির তেজঃ আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে? তুমি অতিক্রম করিয়া যাইওনা, ইঁহার তেজে দগ্ধ হইবে।"



অগ্রবর্ত্তী হংসটী বলিল,—"এই ব্যক্তি এমন কে যে, তুমি ইঁহার বিষয় এরূপ বলিতেছ ? এ যেন শকটবান্ রৈক্ক !"

হংস জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যে শকটবান্ রৈক্কের কথা বলিতেছ, তিনি কে ?" দ্বিতীয় হংস বলিল,—"যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় আছে বলিয়া লোকে মনে করে, রৈক্ক তাহা সকলই জানেন, ইহাই রৈক্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।"

মহারাজ জানশ্রুতি এই সকল কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার সারথিকে বলিলেন,—"তুমি শকটবান্ রৈক্কের অন্বেষণ কর ; হংসের মুখে শুনিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ।" সারথি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও রৈক্ককে না পাইয়া রাজার নিকট উহা জানাইল। রাজা বলিলেন,—"যে-স্থানে সাধুগণ থাকেন, সেই সকল নির্জ্জন স্থানে অন্বেষণ কর ।" সারথি রাজার আদেশে পুনরায় অন্বেষণ করিতে করিতে একটি নির্জ্জন স্থানে দেখিতে পাইল,—একটি শকটের নিম্নে একজন লোক তাঁহার গায়ের খোস-পাঁচড়া চুল্‌কাইতেছেন। সারথি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি শকটবান্ রৈক্ক ?" মুনি বলিলেন,—"হাঁ"। তখন সারথি রাজার নিকট ফিরিয়া রৈক্কের সংবাদ জানাইল।

জানশ্রুতি ছয়শত গাভী, এক গাছি সুবর্ণ-হার ও একটী রথ উপহার-স্বরূপ লইয়া রৈক্কের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐগুলি তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ।"

ইহা শুনিয়া রৈক্ক জানশ্রুতিকে বলিলেন,—"রে শূদ্র! তুমি শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছ। অতএব এখন আর তুমি ক্ষত্রিয় নহ, তোমাকে শূদ্রই বলিব। এই সকল গাভী, হার ও রথ তোমারই থাকুক।" তখন রাজা পুনরায় বিবেচনা করিয়া এক সহস্র গাভী, একগাছি সুবর্ণ-হার, একখানি রথ ও নিজের কন্যাকে লইয়া মুনির নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন,—"আপনি এই সকল বস্তু গ্রহণ করুন। আমার এই কন্যাকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করুন এবং এই গ্রামখানিকে আপনার আশ্রমের স্থানরূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। আমাকে আপনার দেবতার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করুন।"

রৈক্ক রাজাকে পুনরায় বলিলেন,—"রে শোকার্ত্ত শূদ্র! গুরু-শুশ্রূষা ব্যতীত কি কেবল দক্ষিণা-দ্বারা জ্ঞান-লাভের অভিলাষ করিয়াছ?" রৈক্ক ইহা বলিয়া রাজাকে প্রাণ-বিদ্যা উপদেশ করিলেন।

শ্রুতি এই উপাখ্যানের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, কেবল যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র বলিয়া পরিচিত হয়, তাহা নহে; লক্ষণের দ্বারাও বর্ণ নিরূপিত হইয়া থাকে—ইহাই বৈজ্ঞানিক, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় রীতি। মহারাজ জানশ্রুতির বিস্তৃত রাজ্য থাকিলেও এবং তিনি দানশীল বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, বিশেষতঃ বহু গাভী, সুবর্ণ-হার, অশ্বসংযুক্ত রথ, রাজকুমারী ও গ্রাম প্রভৃতি লইয়া রৈক্ক-মুনির নিকট উপস্থিত থাকিলেও এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও

মহামুনি রৈক্ক জানশ্রুতিকে শোকে অভিভূত জানিয়া 'শূদ্র' নামেই প্রথমতঃ আহ্বান করিলেন। জানশ্রুতি যখন জানিতে পারিলেন, রৈক্ক-মুনির সম্মানের নিকট তাঁহার যশঃ অতি সামান্য, তখন তাঁহার হৃদয়ে শোক উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন রৈক্ক দেখিলেন, জানশ্রুতির হৃদয় সাময়িকভাবে শোকে আচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার হৃদয়ে গুরুসেবা-বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তিনি জানশ্রুতিকে প্রাণ-বিদ্যা উপদেশ প্রদান করিলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বাহ্য-আকৃতি বা আচার-ব্যবহার দেখিয়া সদ্‌গুরুর গুরুত্ব নির্ণয় করা যায় না। গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। রৈক্ককে একটি শকটের নিম্নভাগে অবস্থিত বা তাঁহার গায়ে খোস-পাঁচড়া হইয়াছে এবং তিনি সেইগুলি চুলকাইতেছেন দেখিয়া রাজা জানশ্রুতি পরব্রহ্মবিদ্ গুরুদেবে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন নাই। রৈক্কদেব দেহাসক্ত জীবের ন্যায় নিজের শরীরের সুখ-দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত আছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা এই কল্পনা করিলে জানশ্রুতি রাজা প্রাণ-বিদ্যা-রহস্য জানিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেন।

প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে অবধূত-কুলশিরোমণি শ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামী প্রভু সহর নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার এক পায়-খানায় অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা-ব্যাধি-প্রকাশের লীলা করিয়া-ছিলেন। ইঁহাদের ঐরূপ লীলার মর্ম্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝিতে না

পারিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে। জানশ্রুতির রৈক্ক-মুনির প্রতি সেইরূপ মনুষ্য-বুদ্ধির উদয় না হওয়ায় এবং তিনি তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়ায়, বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের তিক্ত-বাক্য-শ্রবণে নিরুৎসাহিত না হওয়ায়, জানশ্রুতিকে যোগ্যপাত্রজ্ঞানে রৈক্কমুনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। রৈক্কমুনি জানশ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন যে, কেবল জাগতিক বস্তুসমূহ দক্ষিণা-স্বরূপ সমর্পণ করিলেই গুরু-সেবা হয় না। সর্ব্বাত্মসমর্পণের সহিত গুরু-শুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুদেবের বাণী-শ্রবণের ইচ্ছা ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

সত্যকাম জাবাল

জবালা নামে এক বিধবার একটি অল্পবয়স্ক পুত্র একদিন মাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"মা! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার গোত্র কি ?"

জবালা পুত্রকে বলিল,—"বৎস! তোমার কোন্ গোত্র, তাহা আমি জানি না। যৌবনে আমি পরিচারিকারূপে বহু (লোকের) পরিচর্য্যা করিতে করিতে তোমাকে লাভ করিয়াছি। কাজেই তুমি কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, ইহাই তুমি তোমার আচার্য্যকে বলিও।"

সত্যকাম আচার্য্য ঋষি হারিদ্রুমত-গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাহার গুরুগৃহে বাসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। গৌতম বালককে গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল,—"ভগবন্! আমার গোত্র কি, তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থায় পরিচারিকারূপে বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। আমার মাতার নাম—জবালা এবং আমার নাম—সত্যকাম।"

বালকের মুখে এইরূপ নিষ্কপট ও সরল বাক্য শুনিয়া গৌতম অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"অব্রাহ্মণ কখনই এইরূপ সরল ও নিষ্কপটভাবে সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি যজ্ঞের কাষ্ঠ লইয়া আইস। আমি তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে বিচলিত হইও না।"

এই কথা বলিয়া ঋষি গৌতম সত্যকামকে উপনয়ন প্রদান করিলেন এবং তাহার উপর সেবার ভার অর্পণ করিলেন। গৌতম নিজের গোশালা হইতে চারিশত দুর্ব্বল ও কৃশ গাভী বাহির করিয়া ঐ গাভীগুলিকে চরাইতে দিলেন। গাভীগুলি লইয়া যাইবার সময় সত্যকাম বলিলেন,—"আমি চারিশত গাভীকে একসহস্র না করিয়া ফিরিব না।" ক্রমে সত্যকামের সেবা-ফলে গাভীগুলি এক সহস্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই সময় একদিন একটী বৃষ সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল,—"সৌম্য! আমাদের সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি এখন

আমাদিগকে আচার্য্যের গৃহে লইয়া চল।" ঐ বৃষের মধ্যে বায়ুদেবতা আবিষ্ট ছিলেন। তিনি সত্যকামকে ডাকিয়া ব্রহ্মের একপাদ-বিভূতির কথা উপদেশ করিলেন এবং অগ্নি সত্যকামকে দ্বিতীয় পাদের উপদেশ করিবেন, জানাইলেন। পরদিন সত্যকাম গাভীগুলিকে লইয়া গুরুগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথে যেস্থানে সন্ধ্যা হইল, সত্যকাম সেই স্থানে গরুগুলি রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অগ্নি তখন সত্যকামকে ডাকিয়া ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ বিভূতির কথা বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, হংসরূপী সূর্য্য সত্যকামকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের কথা উপদেশ করিবেন।

পরদিন সত্যকাম গাভী-সমূহ লইয়া গুরুগৃহের অভিমুখে গমন করিতে করিতে যে স্থানে সন্ধ্যা হইল, সেই স্থানেই গাভী-গুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলেন। হংস সত্যকামের উপরিভাগে আসিয়া ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের কথা উপদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রাণদেবতা 'মদ্গু' নামক জলচর পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সত্যকামকে চতুর্থ পাদের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সত্যকাম পরের দিন গুরুগৃহের দিকে যাইতেছিলেন। যে-স্থানে সন্ধ্যা হইল, সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিলেন। প্রাণ 'মদ্গু' পক্ষীর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মের চতুর্থ-পাদের কথা উপদেশ করিলেন।

সত্যকাম এইরূপে ব্রহ্মবিৎ হইয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য্য গৌতম সত্যকামকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যকাম নিষ্কপট সেবা ও শ্রবণের ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলে,—"তোমাকে কে পর-ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ করিল ?" সত্যকাম বলিলেন,—"মনুষ্য ভিন্ন অন্যে আমাকে ইহা উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিলেও আমার সিদ্ধিলাভের জন্য পুনরায় আপনি উপদেশ করুন। কারণ, আমি শুনিয়াছি,—"আচার্য্যের উপদিষ্ট বিদ্যাই সিদ্ধিপ্রদা হয়।"

সত্যকামের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য পূর্ব্ব-কথিত বিদ্যাই পুনরায় উপদেশ করিলেন। সত্যকাম তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করায় তিনিও আচার্য্য হইলেন। উপকোশল নামক মুনি আচার্য্য সত্যকামের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

জবালা ও সত্যকামের এই উপাখ্যান হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। শ্রুতি সরল ও নিষ্কপট সত্যবাদিতাকেই 'ব্রাহ্মণতা' বলিয়াছেন। সত্যকাম যৌবনে বহু (লোকের) পরিচর্য্যাকারিণী একটি পরিচারিকার পুত্র হইলেও আচার্য্য গৌতম সত্যকামকে নিষ্কপট ও সরল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া গুরুসেবায় ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভে অধিকার দিয়াছিলেন। অতএব কেবল যে ব্রাহ্মণের পুত্রই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া গৃহীত হইবে,

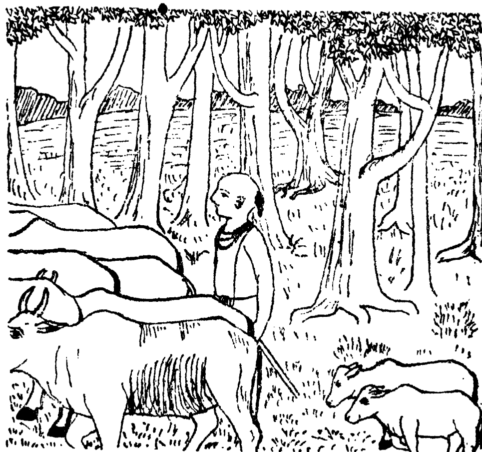
তাহা নহে। যে-কোন কুলোদ্ভূত বা অজ্ঞাত-গোত্র ব্যক্তিরও বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণের দ্বারাই ব্রাহ্মণতা নিরূপিত হয়। ইহা সামাজিক ব্রাহ্মণতা নহে, পরন্তু মহাভাগবতবর গুরুদেবের দাস্যসূচক পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা।

সত্যকামের গুরুসেবার আদর্শ প্রত্যেক নিষ্কপট ব্যক্তিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সত্যকাম কিরূপ উৎসাহের সহিত নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া গুরুদেবের গাভীসমূহকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন! 'যখন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে গুরুগৃহে আসিয়াছি, তখন বসিয়া বসিয়া কেবল ধ্যান করিব'—সত্যকামের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় নাই। তিনি গুরুদেবের গোধন-সমূহ কি করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, সেই ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। নিষ্কপটভাবে গুরুসেবার সহিত তিনি ভগবানের তত্ত্ব-সমূহ উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিষ্কপট গুরু-সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আচার্য্যের ইচ্ছায়ই দেবতাগণ তাঁহাকে ভগবানের তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দাম্ভিক না হইয়া আবার শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া সেই সকল কথাই শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে সাক্ষাদ্ভাবে শুনিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও সত্যকাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, মহান্ত-গুরুর নিকট হইতে সকলকেই সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের কথা শুনিতে হইবে। এইরূপ সরল, নিষ্কপট, গুরু-সেবারত দীনচিত্ত ব্যক্তিই অপরের মঙ্গল করিতে পারেন। তিনিও আচার্য্য হইয়া গুরুদেবের বাণীর বক্তা

হইতে পারেন। জগতে এইরূপভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায়ই বা শ্রৌত-পথেই নিত্য আম্নায়ধারা প্রবাহিতা থাকে।

উপমন্যু

আয়োদধৌম্য মুনির উপমন্যু-নামে এক শিষ্য ছিল। উপমন্যু গুরুদেবের আদেশে তাঁহার গোধন রক্ষা ও গোচারণ করিতেন। গুরুদেব উপমন্যুকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সে দিবা-ভাগে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিবে।



তদনুসারে উপমন্যু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গুরু-গৃহে আসিয়া গুরু-দেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতেন।

একদিন গুরুদেব উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। তুমি কি আহার করিয়া থাক?" উপমন্যু উত্তর করিলেন,—"ভগবন্! আমি ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলিলেন,—"দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ কোন বস্তু গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।" উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণ-পূর্ব্বক গুরুদেবকে অর্পণ করিলেন। আচার্য্য সমস্ত ভিক্ষান্নই গ্রহণ করিলেন, উপমন্যুকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আগমন-পূর্ব্বক গুরুদেবকে নমস্কার করিলেন। আচার্য্য উপমন্যুকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তোমার সমস্ত ভিক্ষান্নই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তথাপি তোমাকে এরূপ স্থূলকায় দেখিতেছি কেন? তুমি কি ভোজন করিয়া থাক?" উপমন্যু বলিলেন,—"ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া নিজে ভোজন করিয়া থাকি।" আচার্য্য কহিলেন,—"দেখ, ইহা শিষ্টলোকের ধর্ম্ম ও উপযুক্ত কর্ম্ম নহে, ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে। আর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে।"

শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া উপমন্যু আর এক-দিন পূর্ব্বের ন্যায় গোচারণ ও সন্ধ্যাকালে গুরু-গৃহে আগমন করিলে আচার্য্য উপমন্যুকে কহিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তুমি

ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কর, তাহা আমি সকলই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং আমি নিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না। তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় দেখিতেছি। তুমি আজকাল কি ভোজন করিয়া থাক ?" উপমন্যু বলিলেন,—"আমি গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি।" আচার্য্য কহিলেন,—"আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিবার অনুমতি প্রদান করি নাই। গরুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।"

উপমন্যু গুরুদেবের নিকট অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অন্য আর একদিন তিনি গো-চারণ করিয়া গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া প্রণত হইলেন। গুরুদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস উপমন্যু, তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কিম্বা দ্বিতীয়বার ভিক্ষার জন্য পর্য্যটন কর না। গাভীর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে স্থূল দেখিতেছি কেন ? তুমি এখন কি ভোজন কর ?" উপমন্যু বলিলেন,—"গোবৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয় যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি।" আচার্য্য বলিলেন, —"অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি দয়া করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি তাহাদিগের ভোজনের ব্যাঘাত করিতেছ। আর তুমি ঐরূপ করিও না।"

উপমন্যু, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন বনে গোচারণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিবেন, গুরুসেবার

জন্য কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কয়েকটী অর্কপত্র (আকন্দ-পাতা) ভোজন করিলেন। ইহা ভোজন করায় উপমন্যুর চক্ষুরোগ জন্মিল এবং তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন। এইরূপ অন্ধ হইয়া একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপের মধ্যে পতিত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল, অথচ উপমন্যু গোচারণ করিয়া ফিরিতেছেন না দেখিয়া আচার্য্য চিন্তিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট বলিতে লাগিলেন,—"আমি উপমন্যুকে সকল প্রকার আহার হইতেই নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছি। বোধ হয়, সেইজন্য সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাই এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না।" এই বলিয়া আচার্য্য কতিপয় শিষ্যকে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু আচার্য্যের স্বর শুনিয়াই অতি বিনীতভাবে উচ্চকণ্ঠে কূপের মধ্য হইতে তাঁহার অবস্থা জানাইলেন।

আচার্য্য উপমন্যুর এইরূপ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে দেবতাগণের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে উপমন্যুর চক্ষুরোগ বিদূরিত হইতে পারে জানাইলেন।

উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী পিষ্টক ভোজন করিতে দিয়া বলিলেন যে, উহা ভোজন করিলেই তাঁহার রোগ অচিরে বিনষ্ট হইবে।

উপমন্যু বলিলেন,—"আমি শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই পিষ্টক ভোজন করিতে পারি না।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন,—"পূর্ব্বে তোমার গুরুদেব আমা-দিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও এক পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার গুরুর আদেশ না লইয়াই তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। অতএব তোমার আচার্য্য যাহা করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর।"

উপমন্যু কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—"আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, আপনারা আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। আমি গুরু-দেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভোজন করিতে পারিব না।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপমন্যুর এইরূপ গুরুভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—"তোমার দন্ত-সকল হিরণ্ময় হইবে, তুমি পুনরায় চক্ষুরত্ন ফিরিয়া পাইবে এবং তোমার পরম মঙ্গল লাভ হইবে।"

উপমন্যু চক্ষু লাভ করিয়া গুরুদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। আচার্য্য ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উপমন্যুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ; সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতি-পথে থাকিবে এবং তোমার পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।"

মহাভারতের এই আখ্যায়িকাটিতে গুরুসেবকের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত গুরুসেবক গুরুর কোন বস্তুকে ভোগ করিবেন না। সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। গুরুদেবের আদেশ যতই

কঠোর ও তীব্র হউক না কেন, গুরুসেবক অবিচলিত-চিত্তে সন্তোষের সহিত তাহা পালন করিবেন। গুরুসেবা করিতে করিতে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক, প্রাণও যদি বিনষ্ট হয়, তাহাও আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন। গুরুসেবকের বিচার এইরূপ,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥"

শ্রীগুরুদেবের আচরণ অনুকরণ না করিয়া তাঁহার বাণী ও শিক্ষার অনুসরণ ও পরিপালন করিলেই বঞ্চিত হইতে হয় না। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কথায় উপমন্যু তাঁহার গুরুদেবের আচরণ অনুকরণ করিয়া গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত পিষ্টক ভোজন করেন নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মহাপুরুষের বাণীরই অনুসরণ করেন। তদ্দ্বারাই সমস্ত অভীষ্ট-লাভ হয়। যিনি এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত গুরুসেবা করেন, তিনিই পৃথিবীর সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তাঁহারই হৃদয়ে সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হয় ও তাহা সর্ব্বকাল স্মৃতি-পথে বিরাজিত থাকে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই চরম মঙ্গল কৃষ্ণসেবা-লাভ হয়।



অর্জ্জুন ও একলব্য

একলব্যের গুরুভক্তি (?) অনেকের নিকটই আদর্শ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

রাজা হিরণ্যধনুর পুত্রের নাম ছিল একলব্য। একলব্য ছিল জাতিতে নিষাধ (চণ্ডাল)। রাজকুমার একলব্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। আচার্য্য একলব্যকে নীচজাতি-বোধে তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু একলব্য দ্রোণাচার্য্যের নিকটই অস্ত্র-শিক্ষা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া এক বনে গমন করিল। তথায় দ্রোণাচার্য্যের একটী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই কাল্পনিক গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে তাহাতেই বিশেষ-পারদর্শিতা লাভ করিল।

দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন অর্জ্জুন। আচার্য্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার (দ্রোণাচার্য্যের) কোন শিষ্য অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না।

একদিন দ্রোণাচার্য্যের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবগণ রাজধানী হইতে মৃগয়া করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদেরই অগ্রগামী একটী কুকুরের মুখে

একসঙ্গে সাতটী বাণ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যিনি এই বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি পাণ্ডবগণ অপেক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় অধিক পারদর্শী, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা ঐ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য কুকুরের মুখে ঐ বাণ প্রয়োগ করিয়াছে।

পাণ্ডবেরা রাজধানীতে ফিরিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুন বিনীতভাবে দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন যে, তাঁহা (অর্জ্জুন) অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যায় অধিক পারদর্শী আচার্য্যের এক শিষ্য আছেন।

দ্রোণাচার্য্য এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অর্জ্জুনের সহিত বনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, একলব্য পুনঃ পুনঃ বাণ বর্ষণ করিতেছে এবং সে যেন ধনুর্বিদ্যাশিক্ষায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলে আচার্য্যকে অকস্মাৎ দেখিয়া একলব্য তৎপাদদ্বয় বন্দনা করিল ও তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিল। একলব্যকে দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—"তুমি গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" একলব্য বলিল,—"আপনি যাহা আদেশ করেন, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" তখন দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে তাহার দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণা দিতে বলিলেন। একলব্য গুরুদেবের আদেশ পালন করিল।

একলব্য কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া অম্লানবদনে গুরুর এইরূপ আদেশ পালন করিয়াছিল। গুরুদেব প্রথমে একলব্যকে নীচজাতি বলিয়া উপেক্ষা করিলেও সে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা না হারাইয়া তাঁহার (দ্রোণাচার্য্যের) মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুরুভক্তির আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু অপর দিকে অর্জ্জুন একলব্যের প্রতি যেন ঈর্ষান্বিত হইয়াই একলব্য নিজের অধ্যবসায়-বলে যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহাও দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা নষ্ট করাইয়াছিলেন, ইহাই সাধারণের বিচার। কিন্তু ভক্তের বিচার বা সত্যের বিচার তাহা নহে। ভগবান্ই পরম সত্য, তাঁহার ভক্তি-নীতি পরম সত্য ও তাঁহার ভক্ত পরম সত্য। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিসত্য। ভক্তের সব ভাল, অভক্তের কিছুই ভাল নহে। অভক্তের গুণগুলিও দোষ; কারণ, তাহা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নিযুক্ত হয় না। যাহারা ভগবান্ হইতে প্রাকৃত নীতিকে বড় মনে করে, তাহারা এই পরম সত্যের কথা ধরিতে পারে না। তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদী বলে অর্থাৎ তাহারা ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির অদ্বিতীয় বিশেষত্ব স্বীকার করে না।

একলব্যের অসুবিধা কোথায় হইয়াছিল, তাহা বিচার করা আবশ্যক। একলব্য গুরুভক্তির মুখোস পরিধান করিয়া গুরু-দ্রোহ করিয়াছিল। গুরুদেব যখন একলব্যকে নীচজাতি মনে করিয়াই হউক, অথবা পরীক্ষা করিবার জন্যই হউক, কিংবা যে-কোন কারণেই হউক, তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে চাহিলেন না, তখন একলব্যের উচিত ছিল—গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করা; কিন্তু

তাহাতে একলব্যের মন উঠিল না ; সে 'বড়' হইবার ইচ্ছা করিল। কেবল বাহিরে একটা 'গুরু' না করিলে কার্যটী নীতি-সঙ্গত হয় না, অথবা তাহার 'বড়' হইবার পক্ষে সুযোগ হয় না, এজন্যই একলব্য গুরুর (?) কাল্পনিক বা মাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। কাজেই এখানে 'বড়' হওয়া বা ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাই, এক কথায় নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। গুরুর ইচ্ছায় নিজকে 'বলি' দেওয়া তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, একলব্য শেষে ত' কোন প্রতিবাদ না করিয়াই গুরুর নির্ম্মম আদেশ আনন্দের সহিত পালন করিয়াছিল ; কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, এখানেও একলব্য অপ্রাকৃত-ভক্তি অপেক্ষা নীতিকেই 'বড়' বলিয়া মনে করিয়াছিল। গুরুদেব দক্ষিণারূপে যে-কোন জিনিষ প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রদান করিতে হইবে,—এই নীতিই তাহাকে অঙ্গুলি ছেদনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। বস্তুতঃ একলব্য স্বাভাবিক ভক্তির সহিত উহা প্রদান করে নাই। ভক্তি-বৃত্তিটী—স্বাভাবিক ও সরল।

একলব্যের হৃদয়ে যদি হরি, গুরু ও বৈষ্ণবে অহৈতুকী ও স্বাভাবিকী ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে গুরু 'দ্রোণাচার্য্য' বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও ভগবান্ কৃষ্ণ একলব্যের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না। একলব্যের ঐরূপ ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা বা 'বড়' হওয়ার চেষ্টাকে গুরুদেব স্বীকার করিলেন না। একলব্যের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ছিল—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন হইতেও বড় হইবার অভিলাষ ও চেষ্টা।

বৈষ্ণব অপেক্ষা 'বড়' হইবার অভিলাষ—'ভক্তি' নহে,

উহা অভক্তি বা 'অতিবড়ী'র ধর্ম্ম। জগতের বিচারে ঐরূপ 'বড়' হওয়ার চেষ্টা ভাল মনে হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবের পশ্চাতে থাকিবার চেষ্টা, তাঁহার অনুগত থাকিবার চেষ্টার নামই—'ভক্তি'। একলব্য শ্রৌত-বিদ্যা বা মহান্ত-গুরুর নিকট হইতে সাক্ষাদ্ভাবে অধীত বিদ্যা অপেক্ষাও নিজের বাহা-দুরীকে 'বড়' করিতে চাহিতেছিল, তাহা অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিকট জানাইয়াছিলেন। যদি অর্জ্জুন কৃপা করিয়া ইহা না জানাইতেন, তবে নির্ব্বিশেষবাদেরই 'জয়' বিঘোষিত হইত। লোকে মহান্ত-গুরুর নিকট বিদ্যা-শিক্ষা না করিয়াও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাল্পনিক বা মাটিয়া অচেতন গুরুর নিকট বিদ্যা বা ভক্তি শিক্ষা করিতে পারে—এইরূপ নাস্তিক মতই প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব অর্জ্জুন একলব্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন নাই, একলব্যের প্রতি ও জগতের প্রতি অহৈতুকী দয়াই করিয়াছেন।

একলব্য যদি নিষ্কপট গুরু-ভক্তই হইবে, তবে সেইরূপ গুরুভক্তকে কৃষ্ণ বিনাশ করিতে পারেন না; তাঁহার ভক্তকে তিনি রক্ষাই করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হস্তে একলব্য নিহত হইয়াছিল। ইহাই একলব্যের শেষ পরিণতি।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—"কেবল বাহিরের তপস্যা দেখিয়া উহাকে 'ভক্তি' বলা যায় না, অসুরেরাও তপস্যা করে; তাহাদের মত তপস্যা দেবতারাও করিতে পারেন না।" * একলব্য গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈষ্ণব অপেক্ষা 'বড়' হইতে চাহিয়াছিল

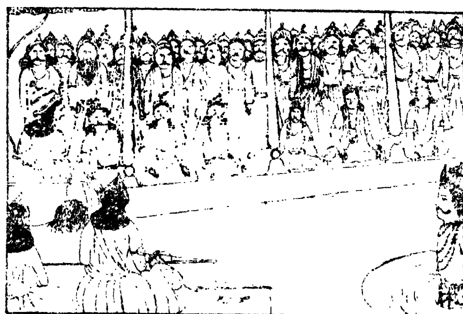
* শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য, ২৩ অধ্যায়, ৪৬ সংখ্যা।

বলিয়া কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়া নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে। অসুরেরাই কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে, ভগবদ্‌ভক্তেরা কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হন। হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ তাহার প্রমাণ। অতএব আমরা যেন বৈষ্ণব হইতে 'বড়' হইবার জন্য গুরুভক্তির মুখোস পরিধান না করি, নির্ব্বিশেষবাদী না হই,—ইহাই একলব্যের উদাহরণ হইতে শুদ্ধভক্তের শিক্ষা করিবার বিষয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মদক্ষতা কিছু গুরুভক্তি নহে, বৈষ্ণবের আনুগত্যই ভক্তি।

দুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত

খাণ্ডব-বন-দহনকালে অর্জ্জুন ময়দানব-নামক এক বিখ্যাত শিল্পীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভা অতি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহু মণি-মুক্তা-প্রবাল-মর্ম্মর-প্রস্তরাদির দ্বারা সভাটি এইরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তাহা পৃথিবীর সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দুর্য্যোধন রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া যখন সর্ব্বপ্রথমে ঐ সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি

সভার সেই শোভা দেখিয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। সম্মুখে স্বচ্ছ-স্ফটিক-নির্ম্মিত সভা-প্রাঙ্গণ-দর্শনে দুর্য্যোধনের 'জলাশয়' বলিয়া ভ্রম হইল। জলভ্রমে দুর্য্যোধন পরিহিত-



বস্ত্রাদি উত্তোলন করিয়া যেমন তাহা অতিক্রম করিতে যাইবেন, অমনিই সভাস্থ সকলেই করতালি-সহকারে হাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন। পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দুর্য্যোধন এক স্থানে সত্য সত্যই স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন। দুর্য্যোধন মনে মনে চিন্তা করিলেন—'পূর্ব্বে একবার স্বচ্ছ প্রস্তরকে জল মনে করিয়া লজ্জিত হইয়াছি, এবার অপ্রস্তুত হইলে আর অপমানের সীমা থাকিবে না। পূর্ব্বে জল বলিয়া অনুমিত বস্তুটি যখন প্রস্তর হইল, এবারও নিশ্চয়ই তাহাই হইবে।' এইরূপ ভাবিয়া দুর্য্যোধন প্রস্তর-ভ্রমে জলে পতিত হইয়া উহাতে নিমজ্জিত হইলেন। তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই পুনঃ পুনঃ করতালি-সহ

অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধন অন্যত্র স্ফটিক-প্রাচীরকে উন্মুক্তদ্বার মনে করিয়া যখন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন প্রাচীর-গাত্রের আঘাতে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরে এক বিস্তৃত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রতারিত হইবেন মনে করিয়া দ্বারপথে নির্গমনে বিরত হইলেন। দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধভাবে নিজে প্রতারিত হইলে তাঁহার মর্ম্মস্থল অপমানের জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি তখন খিন্ন-মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের ইহাও একটি প্রধান কারণ।

দুর্য্যোধন (দু + যোধন)—অর্থাৎ অন্যায়-পথে যুদ্ধাভিলাষী ভোগী। তাহার বৃত্তি এই যে,—কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান না করিয়া নিজেই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। আর যুধিষ্ঠির (যুধি + স্থির)—ধর্ম্মরাজ, তিনি সত্য ও ন্যায়-যুদ্ধে স্থির। কৃষ্ণের ইচ্ছা পরিপূরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। দুর্য্যোধনের মত স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু-কৃষ্ণের অভিলাষ-পূর্ণকারী সত্যসঙ্কল্প ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী। কিন্তু বিদ্বেষি-নয়নে ভক্তের কার্য্য সমস্তই বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। বিপরীত বোধ করিয়া ভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

ভোগী বদ্ধজীব ভক্তের বিদ্বেষী হইয়া যাহা 'জল', তাহাকে 'স্থল' মনে করে এবং 'স্থল'কে 'জল' মনে করে। যাহা 'আশ্রয়', তাহাকে 'নিরাশ্রয়' এবং যাহা 'নিরাশ্রয়', তাহাকে 'আশ্রয়' মনে করিয়া ডুবিয়া যায়। ভক্তসঙ্গই—'আশ্রয়', মায়াই—নিরাশ্রয়।

ভক্ত-বিদ্বেষ হইলেই মায়ার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইতে হইবে। মায়াবাদিগণের * ভক্ত-ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ এই প্রকার বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অধোগতি হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম-ভঞ্জন

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র নিহত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনই ধৃতরাষ্ট্রের অধিকাংশ পুত্রকে বধ করেন। তিনিই দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ এবং দুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ভীমসেনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অত্যন্ত ক্রোধ ছিল। কৌরব-ধ্বংসের পর হস্তিনাপুরী হইতে নির্গত হইবার কালে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব বৃদ্ধ কুরুরাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসন্তোষের সহিত যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা দান করিলেন। তৎপরে আলিঙ্গনচ্ছলে বধের অভিপ্রায়ে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্দাভিপ্রায় পূর্ব্ব হইতেই

* মায়াবাদী—যাহারা মায়া লইয়া বাদ উঠায় অর্থাৎ যিনি মায়াধীশ পরব্রহ্ম ভগবান্‌, তিনিও মায়ার কবলে কবলিত হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হন, কিম্বা নারায়ণ দরিদ্র-আর্ত্তরূপে প্রতিভাত হন,—যাহারা এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন। বস্তুতঃ ভগবান্‌—মায়াধীশ; তাঁহার বিভিন্ন অংশ অণুচৈতন্য জীব মায়াবশযোগ্য।

অবগত হইয়া একটী লৌহময় ভীম প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টাভিপ্রায় ও ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন লোহ-ভীমটিকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে প্রদান করিলেন। কপট ধৃতরাষ্ট্র তখন তাহার শতপুত্র-বধের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই লৌহভীমকে বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন।



ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে বহু হস্তীর সামর্থ্য ছিল। তাঁহার আলিঙ্গনে অতি কঠিন লোহভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল ক্ষত-বিক্ষত হইল এবং তিনি নিজেও রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা-স্পৃহা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

'ধৃতরাষ্ট্র' শব্দের অর্থ—যাঁহার দ্বারা রাষ্ট্র বা রাজ্য ধৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি মায়ার রাজ্যের (জড় জগতের) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অবলম্বনীয় বা আশ্রয়যোগ্য বস্তু বলিয়া বিচার করেন, তিনিই ধৃতরাষ্ট্র। জড়ীয় চিন্তাস্রোতঃ যাহার

হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া থাকে, যে জড়াতীত অপ্রাকৃত বস্তুর বা চিদ্‌বিলাসের * কোন সন্ধান রাখে না, সেইরূপ ব্যক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতীক। ধৃতরাষ্ট্র—জন্মান্ধ। তিনি জন্মাবধি জীবনে জগতের বিচিত্রতা দর্শন করেন নাই অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিশেষবাদী। জড়-বাদী ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় মায়াতীত ভক্তকে নিষ্পেষিত করিয়া বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট হয়। কৃষ্ণ-ভক্ত নির্ব্বিশেষবাদীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন দেখিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ অবৈধ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভক্তকে নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত হয়। ইহারা বস্তুতঃ জড়বস্তুকেই পেষণ করিয়া নিজেদের বল ক্ষয়-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে। কৃষ্ণ শরণাগত ভক্তগণকে রক্ষা করেন, ভক্ত-গণের একটী কেশও নির্ব্বিশেষবাদিগণ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় নিজেদেরই বল ক্ষয় করিয়া রক্ত বমন করিতে থাকে।

* চিদ্বিলাস—চেতন জগতে অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণের যে বিলাস, লীলা বা বিচিত্রতা।

শূকররূপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা

স্বর্গবাসী দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্রের গুরু—বৃহস্পতি। এক সময় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আগমন করিলে ইন্দ্র গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত রহিলেন। ইহার ফলে বৃহস্পতির অভিশাপে ইন্দ্র পৃথিবীতে শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শূকররূপী ইন্দ্র শূকরীর সহিত ইচ্ছামত বিহার ও বিষ্ঠা-ভোজনে আনন্দ লাভ করিতে থাকিল। শূকরীর গর্ভে শূকরের অনেকগুলি শাবকও জন্মগ্রহণ করিল।

একদিন ব্রহ্মা ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওহে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী ; তুমি অমরাবতীতে (স্বর্গে) অমৃত-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বিষ্ঠা ভোজন করিতেছ কেন? নন্দনকানন ত্যাগ করিয়া এই ক্লেদপূর্ণ স্থানেই বা এইরূপ বিহার করিতেছ কেন?"

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ঐ শূকর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সপরিবারে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইল এবং দংষ্ট্রা দ্বারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা তাহাতেও শূকর-

রূপী ইন্দ্রের মঙ্গল-বিধানে বিরত হইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ শূকররূপী ইন্দ্রকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ নানাপ্রকার কৌশলে



জানাইবার চেষ্টা করিলেন। ব্রহ্মা যতই ঐ শূকরের মঙ্গল করিবার চেষ্টা করিলেন, শূকর ততই ব্রহ্মাকে তাহার শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিল। শূকর মনে করিল—বিষ্ঠা-ভোজন, ক্লেদপূর্ণ-স্থানে বিচরণ ও পশু-সুলভ গ্রাম্যসুখের উপভোগই তাহার নিত্য-ধর্ম্ম। শূকর ক্লেদপূর্ণ স্থানকেই উহার স্বদেশ, শূকরী ও তাহার শাবকগুলিকেই আত্মীয়-স্বজন জ্ঞান করিয়া ঐ সকল আসক্তির বস্তু কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহিল না।

পরদুঃখ-দুঃখী ব্রহ্মা দেখিলেন,—এই শূকরের দেহ ও গৃহে আসক্তিই সর্ব্ব অনর্থের মূল; অতএব জড়াসক্তি থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহার কর্ণে সদুপদেশ প্রবেশ করিবে না। যে-কোন

উপায়েই হউক, ইহার মঙ্গল করিতে হইবে। তখন ব্রহ্মা শূকরের আসক্তির বস্তু শাবকগুলিকে এক একটি করিয়া বধ করিলেন। চক্ষের সম্মুখে শাবকগণের বিনাশ-দর্শনে শূকররূপী ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা শূকররূপী ইন্দ্রকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশ কিছুতেই ইন্দ্রের কর্ণে পৌঁছিল না। কারণ, তখন শূকরের সকল আসক্তিই শূকরীর প্রতি পতিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা শূকরীটাকেও বধ করিলেন। শূকর এবার চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া শূকর ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আপনি ত' আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে বিনষ্ট করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে আপনি আমাকে স্বর্গে গমনের কথাও বলিয়াছেন; আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি,—"সেই স্বর্গে কি এই স্থানের মত এত উপাদেয় বিষ্ঠা আছে? তথায় কি এইরূপ ক্লেদপূর্ণ শান্তিময় স্থান আছে? তথায় কি শূকরী পাওয়া যাইবে?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তুমি স্বর্গেরই নিত্য-অধিকারী, কেবল শাপভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মফলে এখানে আসিয়াছ। তুমি সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বিষ্ঠা-ভোজনকে আর উপাদেয় মনে করিবে না, তথায় নিত্যকাল অমৃত ভোজন করিতে পারিবে। তখন আর তোমার শূকরীর সহিত গ্রাম্য-সুখ * উপভোগের স্পৃহা থাকিবে না, তুমি অনেক শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।"

*গ্রাম্যসুখ—স্ত্রী-পুরুষের কামজ সঙ্গ প্রভৃতিতে যে ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়সুখ।

স্ত্রী-পুত্রাদি হারাইয়া শূকরের মনে সংসারের অনিত্যতা-উপলব্ধি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন শূকররূপী ইন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে লাগিল এবং কিরূপে সে পুনরায় তাহার স্বদেশে গমন করিতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল; ব্রহ্মাও ইন্দ্রকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া অচিরেই শূকর-জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

জগতের মায়াবদ্ধ জীবগণেরও এইরূপই দশা হয়। জীব-মাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার নিত্যধর্ম্ম, গোলোক-বৈকুণ্ঠই তাহার নিত্য-স্বদেশ। কৃষ্ণের সেবা-সুখের প্রাপ্তিই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জীব যখন সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে, তখন নিজের স্বরূপ, স্বরূপের ধর্ম্ম ও নিত্য-প্রয়োজনের কথা সমস্তই ভুলিয়া যায়। দেহে আসক্ত হইয়া দেহটীকেই তাহার স্বরূপ অর্থাৎ দেহে আমি-বুদ্ধি, দেহের সম্পর্কিত অন্য দেহকেই আত্মীয়-স্বজন এবং দেহের সুখ বা ভোগ-লাভকেই প্রয়োজন মনে করে। যখন জীব এইরূপভাবে নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়, তখন পরম-করুণাময় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া গুরুরূপে জীবের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বদ্ধজীবকে তাঁহার নিত্যস্বরূপের বিষয় উপদেশ করেন। বদ্ধজীব বিষয়বিষ্ঠা-ভোজনে অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া সেই পরম-করুণাময় গুরুদেবকেও নিজের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে এবং গুরু-বৈষ্ণবগণ যতই সদুপদেশ প্রদান

করেন, ততই তাঁহাদিগকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তথাপি পরদুঃখদুঃখী * গুরু-বৈষ্ণবগণ কুবিষয়বিষ্ঠাভোজী জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য অকপট-কৃপা ও প্রযত্ন করেন। বদ্ধজীবকে—বিষয়ি-জীবকে ক্রমে-ক্রমে বিষয় হইতে বঞ্চিত ও জাগতিক দুঃখে-কষ্টে, আপদে-বিপদে ফেলিয়া নানাভাবে এই সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী শোধন করেন। এইরূপভাবে জীব সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিলে তখন জীবের কর্ণে গুরু-বৈষ্ণবগণের মঙ্গলময়ী বাণী প্রবেশ করে। জীব তখন শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গ ও গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভগবানের ভজন করিতে করিতে নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। ক্রমে-ক্রমে স্বরূপসিদ্ধি † ও বস্তুসিদ্ধি ‡ লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদ-পদ্মের নিত্যসেবা-সুখে প্রবিষ্ট হন।

* পরদুঃখদুঃখী—যিনি অপরের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত বা ব্যথিত হন।

† স্বরূপসিদ্ধি—শুদ্ধচেতন জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, ইহাই স্বরূপ বা প্রত্যেকের নিজ-রূপ। এই স্বরূপ-উপলব্ধির সহিত সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকার অবস্থাই স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি-দশা। অষ্টকাল অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সেবায় গাঢ় অভিনিবেশ হইলেই স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই 'সহজ পরমহংস'।

‡ বস্তুসিদ্ধি—স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ কৃষ্ণ-কৃপায় দেহবিগমনকালে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজ-লীলার পরিকররূপে প্রকাশিত হন, ইহাই বস্তুসিদ্ধি ও ভজনের চরম ফল।

রাবণের ছায়া-সীতা-হরণ

সকলেই জানেন যে, লঙ্কার রাজা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী শ্রীজানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং সে তাঁহাকে অনেক দিন অশোক-বনে রাখিয়াছিল। রামচন্দ্র সেতু-বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসেন ও রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সকলের সমক্ষে প্রমাণ করিতে বলেন। অগ্নি-পরীক্ষায় সীতাদেবী উত্তীর্ণা হইলে শ্রীরামচন্দ্র পত্নীকে গ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু। সীতাদেবী রামচন্দ্রের নিত্যগৃহিণী—স্বয়ং লক্ষ্মী। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ছাড়া আর কোন পত্নী গ্রহণ করেন নাই। সীতাদেবীও রাম ছাড়া আর কিছুই জানেন না। শ্রীরাম ও সীতা ইঁহারা মানব-মানবী বা জীব নহেন। রাবণ একজন অসুর ও জীব। অসুরের কি সাধ্য আছে যে, সে লক্ষ্মীদেবীকে হরণ করিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে,—স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দুই চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারে? বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন,—অতিমর্ত্ত্য বস্তুকে মরণশীল জীব দর্শন করিতে পারে না। যেমন, আমরা বদ্ধজীব, এই মাংস-চক্ষুতে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারি না।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন মাদুরাতে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

ঐ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্যদেব কৃতমালা-নদীতে স্নান করিয়া মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা করিতে আসিলেন, তখন দেখিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নকাল আগত হইলেও পাকের কোন আয়োজনই করেন নাই। মহাপ্রভু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"লক্ষ্মণ বন্য শাক-ফল-মূল আনিয়া দিলে তবে রামচন্দ্রের জন্য সীতাদেবী পাকের আয়োজন করিবেন।" ইহা বলিয়া বিপ্র ক্রমে-ক্রমে রন্ধনের আয়োজন করিলেন। মহাপ্রভু তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুই ভোজন করিলেন না, সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিলেন। ব্রাহ্মণ যেন হৃদয়ের গভীর দুঃখে 'হা হুতাশ' করিতেছিলেন ; ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ঐরূপ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি আর প্রাণ ধারণ করিব না ; অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। জগতের মাতা মহা-লক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও কাণে শুনিতে হইতেছে ! ইহা শুনিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। এই দুঃখেই আমার হৃদয় জ্বলিতেছে।" মহাপ্রভু তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। রাক্ষস তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দেখিতেই পারে নাই। রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছে। রাবণ আসিতেই সীতাদেবী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন ও রাবণের সম্মুখে মায়া-সীতাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন, তখন তথায় দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণের সভায় কূর্ম্মপুরাণ-পাঠ হইতেছে। তাহাতে তিনি সীতা-দেবীর কথা-প্রসঙ্গে শুনিতে পাইলেন যে, যখন পতিব্রতা-শিরোমণি জানকী রাবণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি অগ্নির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব ছায়া সীতা প্রস্তুত করিলেন ও মূল-সীতা অগ্নিপুরীতে রহিলেন। রাবণ সেই ছায়া-সীতাকে দেখিয়া উহাকেই প্রকৃত সীতা মনে করিয়া 'ছায়া'-কেই হরণ করিল। অগ্নি সীতাকে পার্ব্বতীর নিকট রাখিয়াছিলেন ও মায়া-সীতা দিয়া রাবণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষা করেন, তখন ছায়া-সীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব সত্যসীতা আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব কূর্ম্মপুরাণের এই প্রসঙ্গের শ্লোকটী প্রাচীন পুঁথির যে পত্রে লেখা ছিল, সেই পত্রটি উক্ত ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়া সেই রামভক্ত বিপ্রকে দেখাইয়াছিলেন।

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মহতী শিক্ষা রহিয়াছে। অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে—নাস্তিকগণ ভক্ত ও ভগবান্, শ্রীমূর্ত্তি, গঙ্গা, তুলসী—এই সকলের উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ। কোন কোন বিধর্ম্মী ভগবানের মন্দিরের উচ্চ-চূড়া এবং শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এতটা প্রত্যক্ষবাদী যে, তাহারা মনে করে,—যখন

চোর, দস্যু ও নাস্তিকগণ শ্রীমূর্ত্তির অলঙ্কারাদি অপহরণ কিংবা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট (?) করিতে পারে এবং ভগবানের তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই (?), তখন শ্রীমূর্ত্তি বা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করা উচিত নহে। ইহারা বুঝিতে পারে না যে, ঐসকল নাস্তিক বা পাষণ্ডগণ সত্য-বস্তুকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারে না। ভগবানের মায়া তাহাদের নিকট সত্যের আকৃতি ধরিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। যাদুকর ধূলি হইতে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লোকের নিকট মায়া সৃষ্টি করে। সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা সাধারণ ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়াও তাহার মধ্যে যে ইন্দ্রজাল আছে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না; তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্, যাঁহার মায়ায় বিশ্ব বিমোহিত, তিনি যে নাস্তিক পাষণ্ডগণকে মায়ার দ্বারা বিমোহিত করিয়া নিজের স্বরূপ গোপন রাখিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?



পরীক্ষিৎ ও কলি

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন,—একটি বৃষ এক পদে বিচরণ করিতেছে এবং একটী গাভী অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে। বৃষটি ঐ গাভীকে তাহার ঐরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—"মা!

তুমি কি আমাকে এক পায়ে হাঁটিতে দেখিয়া শোক করিতেছ? শূদ্র রাজগণ তোমাকে ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়া কি তুমি কাতর হইতেছ? অথবা আজকাল আর কেহই যাগ-যজ্ঞ করে না,—দেবতাগণ আর যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন না,—ইহা দেখিয়াই কি তুমি ব্যাকুল হইয়াছ? যজ্ঞের ভাগ না পাওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র আর পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে বারি বর্ষণ করেন না; ইহাতে প্রজাগণের কষ্ট হইবে—ইহা ভাবিয়াই কি তুমি শোকাকুলা হইয়াছ? এখন পতিগণ স্ত্রীদিগের, পিতা সন্তানদিগের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে না, বরং তাহাদিগের প্রতি রাক্ষসের ন্যায় নির্দ্দয় ব্যবহার করে; এখন ব্রাহ্মণদিগের সদাচার নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষিগণের ভৃত্য হইতেছেন—ইহা দেখিয়াই কি তুমি শোক করিতেছ? কলির আকর্ষণে পড়িয়া ক্ষত্রিয়াধমগণ ভবিষ্যতে রাজ্য নাশ করিবে, প্রজা-সকল শাস্ত্রের নিষেধ না মানিয়া যেখানে-সেখানে স্বাধীনভাবে ভোজন, পান, অবস্থান, স্নান, ব্যভিচার করিতে উন্মুখ হইয়াছে,—ইহা দেখিয়াই কি তুমি শোকযুক্তা হইয়াছ? হে পৃথিবি! ভগবান্ শ্রীহরি তোমার প্রবল ভার অপনোদনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষসুখ হইতেও অধিক সুখপ্রদ যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়াই কি তুমি শোকাকুলা হইয়াছ?"

ঐ একপাদযুক্ত বৃষটি—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আর শোকাকুলা গাভীটি—মাতা বসুন্ধরা। ধর্ম্মের এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবী বলিলেন,—"হে ধর্ম্ম! পাপাত্মা কলির দৃষ্টিতে অভিভূত লোক-

সমূহের জন্যই আমি শোক করিতেছি। তোমার, আমার নিজের, দেবতা, ঋষি, সাধু, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-সকলের দশা ভাবিয়া আমি শোক করিতেছি।"

পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর এইরূপ কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় কিছু দূরেই মহারাজ পরীক্ষিৎ সরস্বতীর তীরে কুরু-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষিৎ দেখিতে পাইলেন, রাজার ন্যায় বেষ ধারণ করিয়া এক শূদ্র বৃষ ও গাভীকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করিতেছে। বৃষটির তিনটি পদই নাই, সে ভয়ে মূত্র ত্যাগ করিতেছিল, আর গাভীটি বৎসহারা অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছিল। রাজা নির্জ্জন স্থানে ঐরূপ দুইটি দুর্ব্বল প্রাণীর উপর অত্যাচার দর্শন করিয়া ঐ শূদ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বৃষ ও গাভীকে অভয় প্রদান করিয়া বৃষকে তাহার তিনটি পদ বিনষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃষ-রূপী ধর্ম্ম ইহার উত্তরে রাজাকে অনেক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন। তখন পরীক্ষিৎ বুঝিতে পারিলেন,—ঐ বৃষটি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। সত্যযুগে তাহার 'তপস্যা', 'শৌচ', 'দয়া' ও 'সত্য'—এই চারিটি পদ ছিল; কলিতে পূর্ব্বের তপস্যা, শৌচ ও দয়া—এই তিনটি পদই বিনষ্ট হইয়াছে; একমাত্র সত্যরূপ একপদে ধর্ম্ম কোনরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাও দুর্দ্দান্ত কলি ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

রাজা ধর্ম্ম ও পৃথিবী-মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কলি তখন অন্য উপায় না দেখিয়া

রাজবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের পদতলে পতিত হইয়া প্রাণ-ভিক্ষা করিতে লাগিল। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে দেখিয়া পরীক্ষিৎ কলিকে বলিলেন,—"তোমার প্রাণের কোনরূপ আশঙ্কা নাই; কিন্তু তুমি আমার শাসিত রাজ্যের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে পারিবে না। তোমার সঙ্গে-সঙ্গে



লোভ, মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, খলতা, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্ম্ম-সমূহ, অবস্থান করে। অতএব যে-স্থানে ধর্ম্ম ও সত্যের অবস্থান, যে-স্থানে ভক্তগণের বাস, তথায় তোমার অবস্থান উচিত নহে।" তখন কলি পরীক্ষিতকে বলিল,—"মহারাজ! আপনার রাজ্য ব্যতীত কোন স্থানই ত' দেখিতে পাইতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন।" তখন পরীক্ষিৎ কলিকে কহিলেন, —"যে-স্থানে তাস, পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা; নানাপ্রকার নেশাপান; পরস্ত্রী-সঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি ও জীব-হিংসা—এই

চারিটি অধর্ম্ম আছে, সেই স্থানে তুমি বাস করিবে ; তোমার বাসের জন্য এই চারিটি স্থান প্রদান করিলাম।”

এই চারিটি স্থান পাইয়াও পুনরায় কলি আরও স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ কলিকে সুবর্ণরূপ আর একটি স্থান দিলেন। এই সুবর্ণের মধ্যে মিথ্যা, অহঙ্কার, কাম, হিংসা ও শত্রুতা এক-সঙ্গেই রহিয়াছে। তখন হইতে কলি এই পাঁচটী স্থানে বাস করিতে লাগিল।

অতএব যে-ব্যক্তি মঙ্গল ইচ্ছা করেন, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক, রাজা, লোকনেতা ও গুরুর পক্ষে ঐ সকল বস্তুর সেবা করা সর্ব্বপ্রকারে অনুচিত। মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপধারী ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণকে সংযোজিত এবং পৃথিবীকেও সংবর্দ্ধিত করিলেন।

যাঁহারা প্রকৃত ও নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা শ্রীহরিনাম, শ্রীভগবান্ ও ভক্তের প্রকৃত সেবা অভিলাষ করেন, তাঁহারা কলির ঐ সকল স্থান হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া হরিভজন করিবেন। ভক্তের জীবনে অনাচার, ব্যভিচার, বৈধ বা অবৈধ স্ত্রী-আসক্তি, মদ্যাদি পানাসক্তি, অর্থ-বিত্তাদিতে আসক্তি, প্রাণি-বধ, মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষ, দাম্ভিকতা বা কোনওপ্রকার তমঃ ও রজোগুণের ক্রিয়া থাকিবে না। তাঁহারা সর্ব্বদা নির্গুণ হরিভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। হরিকথার আচার ও প্রচারের দ্বারা নিজের ও পরের নিত্য উপকার করিবেন।

সতী ও দক্ষ

পার্ব্বতীর পিতা দক্ষ একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে যে-স্থানে যত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, দেবতা প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পত্নীগণকে লইয়া দক্ষের যজ্ঞে গমন করিতে-ছিলেন। দক্ষের কন্যা সতী পিতার যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শুনিয়া ও সকলকে তথায় যাইতে দেখিয়া পিতৃগৃহে যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইলেন। সতী শিবের নিকট পিতার যজ্ঞ-দর্শনে গমন করিবার অনুমতি চাহিলে শিব সতীকে বলিলেন,—"তোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতিদিগের সম্মুখে আমার যেরূপ অপমান করিয়াছেন, তাহাতে তোমার কখনও ঐরূপ পিতার গৃহে যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ দক্ষ তোমাকে কখনই আদর করিবেন না। তোমার পিতা অত্যন্ত অহঙ্কারী; নিরহঙ্কার পুরুষদিগের পুণ্যকীর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় হিংসায় দগ্ধ হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই অসুরগণের ন্যায় শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দ্বেষ করিয়া থাকে। আমি তাঁহাকে নমস্কার বা অভিবাদন করি নাই মনে করিয়া তিনি আমাকে কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি দেহাসক্ত ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণকে বাহিরে অভিবাদনাদি না করিলেও তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ বাসুদেবকে মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া থাকেন। হে সতি! দক্ষ তোমার

দেহের জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহাকে তোমার দর্শন করা উচিত নহে ; অধিক কি, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণকেও তোমার দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।”

সতী আত্মীয়-স্বজনদিগকে দেখিবার জন্য এতটা ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, পতির বাক্য না শুনিয়াই দক্ষের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দক্ষের ভয়ে কেবলমাত্র তাঁহার জননী ও ভগ্নীগণ ব্যতীত আর কেহই সতীর সহিত কোন কথাবার্ত্তাও বলিলেন না। পিতা কোন সমাদর করিলেন না দেখিয়া সতী ভগ্নীগণের কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সতী দেখিতে পাইলেন যে, দক্ষের যজ্ঞে রুদ্রের কোন ভাগ নাই। সতী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, শিবকে অবমাননা করিবার জন্যই দক্ষ ঐ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সতী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের অবমাননা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পিতাকে ক্রোধের সহিত বলিলেন,—“যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই, অতএব যাঁহার কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না, সেই মহাপুরুষ শিবের বিদ্বেষ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন! কোন কোন সাধুপুরুষ অপরের দোষগুলিকেও ‘গুণ’ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হিংসায় এতদূর অভিভূত হইয়াছেন যে, অপরের গুণেও দোষ দর্শন করিতেছেন। যাঁহারা দোষ-গুণের যথার্থ বিচার করেন, তাঁহারা ‘মধ্যম’; আর যাঁহারা তুচ্ছ গুণকেও ‘মহৎ’ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আপনি সেই সর্ব্বোত্তম শিবের প্রতিও দোষ আরোপ করিয়াছেন।

কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে দুইটী কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে অসতের জিহ্বাকে বল-পূর্ব্বক ছেদন করা উচিত এবং তাহার পর নিজের প্রাণ ত্যাগ করাই উচিত। অতএব বৈষ্ণব-বিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত আমার এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না। কেহ যদি না জানিয়া কোন নিন্দিত বস্তু ভোজন করিয়া ফেলে, তবে বমন করিয়াই নিজেকে শুদ্ধ করিতে হয়। আপনার দেহ হইতে জাত আমার এই কুৎসিত দেহে আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিত রহিয়াছি। অতএব আমি আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহকে মৃতদেহের ন্যায় নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব।"—এই বলিয়া সতী যোগ-অবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন।

সতীর এই আদর্শে বিশেষ শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, গুরু ও বৈষ্ণবের অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না। যেখানে সদ্‌গুরু বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, শক্তি থাকিলে সেইরূপ নিন্দাকারীর জিহ্বা স্তব্ধ করাই কর্ত্তব্য ; কিন্তু সকল-ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে বলিয়া অন্ততঃ সেই স্থান সদ্যঃই পরিত্যাগ করা উচিত। নিন্দাকারীর জিহ্বা শুদ্ধ করিতে না পারিলে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন,—গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলেও নিন্দাকারীর প্রতি সামাজিক ও ব্যবহারিক সৌজন্য বা শিষ্টাচার

প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি অনুরাগ হয় নাই, অথবা যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকেও অন্যান্য ব্যবহার-যোগ্য জীবের ন্যায় মনে করেন, ইহা সেইরূপ কপট ব্যক্তিগণেরই অভিমত। সাধারণ লোকপ্রিয়তা হইতেই ব্যবহারিক শিষ্টাচারের উদয়; কিন্তু যেখানে প্রাণের প্রাণ বৈষ্ণব-ঠাকুর নিন্দিত হন, সেখানে আর সে মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। সতীদেবীর আদর্শে দুঃসঙ্গের প্রতি 'অসহযোগ'-নীতির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ বিষ্ণু-বিদ্বেষী পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সতী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি, তাঁহার সম্পর্কিত দেহ-পর্য্যন্ত যোগানলে ভস্মীভূত করিয়া আরও অধিকতর উচ্চ আদর্শ বা বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিয়াছেন।

সতী কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকারী শ্রেষ্ঠ জনৈক পতিরই নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিলে তাঁহাকে সাধারণ ভোগিনী নারীর মত মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে হইবে। তাঁহার আদর্শ আরও অনেক উচ্চ ও অতিমর্ত্ত্য। তিনি পতিকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করিতেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে সতীর প্রত্যেক বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। সতীর দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না, থাকিলে তিনি দেহত্যাগ করিতে পারিতেন না। সাধারণ পতিব্রতা নারীর দেহাত্মবুদ্ধি বা প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি প্রবলা। সতীত্ব রক্ষার জন্য 'জহরব্রত' অবলম্বন করিয়া যে-সকল জাগতিক মহীয়সী ললনা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা

হইতে সতীর আদর্শ কোটিগুণ উচ্চে অবস্থিত। তাঁহার আদর্শে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি অতিমর্ত্ত্য প্রীতির নিদর্শন রহিয়াছে। এজন্যই তাহা সর্ব্বোত্তম।



ধ্রুব

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ রাজার দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি। তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়।

এক সময়ে রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আদর করিতেছিলেন। ইহা দর্শন করিয়া সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার অঙ্কে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইল। রাজা ধ্রুবকে ক্রোড়ে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তখন সুরুচি অতিশয় অহঙ্কারের সহিত ধ্রুবকে কহিলেন,—"তুমি রাজপুত্র হইলেও রাজাসনে বসিবার অযোগ্য। রাজাসনে বসিবার ইচ্ছা থাকিলে তপস্যার দ্বারা ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।" বিমাতার এইরূপ নির্ম্মম বাক্যে ধ্রুব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইল। সুনীতি লোকমুখে ধ্রুবের প্রতি সুরুচির দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন,—"বৎস, আমার ন্যায় দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াই তোমার এইরূপ অবস্থা। যদি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে বিমাতার কথানুযায়ীই ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট কর। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তোমার দুঃখ-মোচনের আর অন্য উপায় নাই। তুমি শরণাগত হইয়া তাঁহার আরাধনা কর।" জননীর এইরূপ বিলাপ ও সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনার নিমিত্ত দৃঢ়চিত্ত হইয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীনারদ ধ্রুবের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বৎস! অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ; তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তোমার জননীর উপদিষ্ট যোগের দ্বারা তোমার পক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করা দুষ্কর। মুনিগণ সহস্র বৎসর সাধনের দ্বারাও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।" ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"প্রভো! কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমি এমন উৎকৃষ্ট পদবী লাভ করিতে পারিব, যাহা আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণও লাভ করিতে পারেন নাই? কৃপা পূর্ব্বক আমাকে তাহা উপদেশ করুন।" দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—"বৎস! ভগবানের সেবাতেই সকল প্রয়োজনের সিদ্ধি হয়। অতএব যমুনার পবিত্র তটে মধুবনে গমন করিয়া তুমি কায়মনোবাক্যে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা কর।" ধ্রুবকে এইরূপ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীনারদ পরমগুহ্য দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। বহুকাল আরাধনার

পর ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি ধ্রুবের নিষ্কপট সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন ও ধ্রুবকে পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিলেন। ধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্, যে যাহা চাহে, আপনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা আপনার নিত্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে আপনার আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মায়ার দ্বারা বঞ্চিত; কারণ, তাহারা অনিত্য বিষয়ের ভোগের নিমিত্ত লালায়িত। ঐরূপ ভোগ নরকেও লাভ হইয়া থাকে। প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজ জনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ-লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখের অনুভব হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! হে অনন্ত! যে-সকল শুদ্ধাত্মা পুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু-মহাত্মার সঙ্গ আমার লাভ হউক। সেইরূপ মহৎসঙ্গবলে আমি আপনার গুণকথা সকল শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখ-পরিপূর্ণ এই ভীষণ সংসার-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।" ধ্রুবের এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন,—"হে সুব্রত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি। আমি তোমাকে যে সমুজ্জ্বল পদ প্রদান করিলাম, এ পর্য্যন্ত কেহই সে-স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, বানপ্রস্থ মুনিবৃন্দ এবং সপ্তর্ষিগণ তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ

করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। হে বৎস, তোমার পিতা সম্প্রতি তোমাকে পৃথিবী-শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি ধর্ম্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে ছত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবে। তোমার বিমাতা সুরুচি তোমার প্রতি হিংসাযুক্তা ছিলেন। তুমি যদিও তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা কর নাই, তথাপি আমার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ আমি সহ্য করি না। তোমার প্রতি হিংসা করিবার ফলে তাহার পুত্র উত্তম মৃগয়া করিতে যাইয়া বিনষ্ট হইবে এবং সে পুত্রের অদর্শনে ব্যথিতা হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আমার আরাধনার ফলে তুমি আমাকে স্মৃতি-পথে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে এবং তদনন্তর আমার ধামে গমন করিতে পারিবে।” ইহা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুবের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল না। তিনি সেই অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভগবানের শ্রীচরণ-দর্শন লাভ করিয়াও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্যসেবা-লাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, এইজন্য তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“অহো! আমার বড়ই মন্দভাগ্য! আমি সংসার-বিনাশক শ্রীহরির পাদপদ্মমূলে উপস্থিত হইয়াও নশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি! সংসার-নিবর্ত্তক ভগবান্‌কে তপস্যা-দ্বারা প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট অসৎসংসারই প্রার্থনা করিয়াছি। হায়! যেমন অতি নির্ব্বোধ নির্ধন ব্যক্তি সম্রাটের নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা

প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরির নিকট অতি তুচ্ছ নশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ-প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমানের বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি।"

এদিকে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবের প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত পুত্রের অভ্যর্থনা করিলেন। সাধু-পুত্রের সঙ্গ-ফলে তাঁহার সুবুদ্ধির উদয় হইল। কিছুকাল পরে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি হরিভজনের জন্য বনে গমন করিলেন।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ উভয়েই অতি শিশুকালেই হরিভজনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের ভক্তির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রহ্লাদ প্রথম হইতেই কোনপ্রকার রাজ্য বা জাগতিক ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য হরির আরাধনার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ধ্রুবের হরির আরাধনার আদর্শে প্রথমে পিতার রাজ্য-লাভের আশায় বা বিমাতার বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া পিতার অনুগ্রহ-লাভের আশায় ভগবানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রহ্লাদকে যখন নৃসিংহদেব বর গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাহার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"যে সেবক প্রভুর নিকট হইতে প্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে কিছু কামনা করে, সে ভৃত্য নহে,—বণিক্।" ধ্রুবও যখন রাজ্য-লাভের আশা লইয়া তপস্যা করিতে করিতে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরির দর্শন পাইলেন, তখন শ্রীহরি ধ্রুবকে বর

দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন,—"প্রভো! আমি রাজ্য-লাভের আশায় তোমার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দেবতা ও মুনি-ঋষিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত দুর্লভ, আমি তোমার সেই দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি কৃতার্থ হইলাম। সামান্য কাঁচ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি চিন্তামণি পাইয়াছি। আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না।" অতএব ধ্রুবের এই আদর্শ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, কোনপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য ভগবানের সেবার অভিনয় করা প্রকৃত সেবা নহে। একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী সেবার জন্যই তাঁহার সেবা করা উচিত। তবে যদি কোন কোন সময় সামান্য কিছু অন্য কামনাও হৃদয়ে থাকে, তাহাও সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নিষ্কপট সেবা-লৌল্যের প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যাভিলাষের দ্বারা ভগবানের সেবা লাভ হয় না। সেবায় প্রবল অকপট উন্মুখতা দ্বারাই অন্যাভিলাষ দূর হয় ও সেবা লাভ হয়।



আদর্শ সম্রাট্ পৃথু

ধ্রুবের বংশে অঙ্গ ; অঙ্গরাজ হইতে বেণ জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই বেণ অতি ক্রূর-স্বভাব ছিল। বেণ যখন মৃগয়া করিতে বনে গমন করিত, তখন পুরজনেরা দূর হইতে বেণকে দেখিয়া "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। সে বাল্যকালেই এতটা নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইত না। রাজা অঙ্গ পুত্রকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য বহু তাড়ন, তর্জ্জন ও নানাবিধ উপায়ে শাসন করিয়া কোনই ফল পাইলেন না। ইহাতে অঙ্গের চিত্তে অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি অর্দ্ধরাত্রে লোকের অজ্ঞাতসারে বেণের গর্ভধারিণীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সকলেই অঙ্গকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। মুনিগণ বেণকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তি যাজন করিবার জন্য নানাপ্রকারে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বেণ বলিল,—"আমি নিজেই ঈশ্বর, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু আবার কে ?" মুনিগণ বিষ্ণু-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া বেণকে বিনাশ করিলেন।

বেণ-জননী বেণের মৃতদেহকে মন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিলেন। এদিকে রাজ্য-মধ্যে নানাপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া ঋষিগণ বিচার করিলেন যে, রাজর্ষি ধ্রুবের বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নহে; কারণ, তথায় অনেক বিষ্ণুভক্ত মহাভাগবত-নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন মুনিগণ বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহা হইতে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী উৎপন্ন হইলেন। এই দুইটিই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশ। পুরুষটীর নাম—পৃথু ও স্ত্রী-মূর্ত্তিটীর নাম—অর্চ্চি। কালক্রমে পৃথু মহারাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ও আনুগত্যে পৃথিবী প্রজাগণকে নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। পৃথু অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। ইন্দ্র পৃথু-পুত্রের বিক্রমে ভীত হইয়া কপট ধার্ম্মিক-বেশে অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত যে-সকল কপট-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই পাপের 'ষণ্ড'। 'ষণ্ড' শব্দের অর্থ—চিহ্ন। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ—'পাপ-চিহ্ন'। দিগম্বর জৈন-গণ, রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধগণ ও কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ ঐ 'পাষণ্ড'-বেশ ধারণ করিয়া থাকে।*

পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মা পৃথুকে উহা হইতে নিবারণ করিলেন।

* শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১৯।২৪-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞেশ্বর হরি ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুকে বলিলেন—"ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি ইঁহাকে ক্ষমা কর।" পৃথু শ্রীভগবানের আদেশ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রও পৃথুর পদযুগে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুকে বর প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; তখন পৃথু শ্রীহরিকে বলিলেন,—"যাঁহাদিগের বর দান করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ দেবতাগণেরও আপনি ঈশ্বর। কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আপনার নিকট দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের কাম্য বর প্রার্থনা করেন? ঐ সকল ভোগ্য-বস্তু নরকবাসী দেহধারিগণেরও আছে। যদি মুক্তির পদবীতেও আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সুধার যশোগান বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমি সেইরূপ মোক্ষও প্রার্থনা করিব না। আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, আমি অন্য কিছু চাহি না। যে-ব্যক্তি মহাপুরুষগণের সঙ্গে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশঃ একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না।" পৃথু মহারাজের এই উক্তি ও শিক্ষা শুদ্ধভক্তগণের শিরোভূষণ।

বৈষ্ণব-সম্রাট্ পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পরম পবিত্র দেশে বাস করিয়া অনাসক্তভাবে শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণের সেবার

উদ্দেশ্যে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল; কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বপ্রভু বৈষ্ণব-গণের উপর তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। তিনি প্রজার প্রকৃত মঙ্গলকামী আদর্শ প্রজা-পালক রাজা ছিলেন। প্রজাগণ যাহাতে সকলেই শ্রীহরির সেবায় অনুরাগযুক্ত হন, এজন্য তিনি তাহাদিগের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচার করিতেন। প্রজাগণ রাজার বিলাস-বৈভব উৎপাদনের যন্ত্র, ইহা তিনি কখনই মনে করিতেন না। তিনি কোন প্রকার নাস্তি-কতার প্রশ্রয় দিতেন না। প্রজাগণের প্রতি তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে। * তিনি প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা শ্রীভগবানের সেবায় সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া তোমাদের অধিকারানুসারে নিষ্কপটে কায়, মনঃ, বাক্য, গুণ ও স্বকর্ম্মাদি দ্বারা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম ভজনা কর। এই পৃথিবীতে আমার যে-সকল প্রজা দৃঢ়ব্রত হইয়া জগদ্‌গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজঃ আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলে এবং বিষ্ণুসেবা-সর্ব্বস্ব বৈষ্ণবকুলে 'যেন কখনও প্রভাব বিস্তার না করে। আমি যেন আত্মবিদ্‌গণের পদরেণু নিজের মুকুটের উপর যাবজ্জীবন ধারণ করিতে পারি।"

* শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ২১শ অধ্যায়।

শ্রীভগবানের আদেশে মহর্ষি সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ পৃথু মহারাজের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। নিষ্কিঞ্চন পুরুষগণ বিষয়ী বা রাজ-দর্শন করেন না, কিন্তু পৃথুর ন্যায় বৈষ্ণব-সম্রাট্‌কে কৃপা করিবার জন্য সনৎকুমারাদি রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পৃথু স্ব-হস্তে তাঁহাদের সেবা করিয়া বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। পৃথু সেই সকল মহাভাগবতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবার উপযোগী জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবার উপকরণ-সমূহ বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য। যে-সকল গৃহ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের পাদোদকের দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সেই সকল গৃহ প্রচুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষের ন্যায় মৃত্যুভয় আনয়ন করে। হে প্রভুগণ! জড়েন্দ্রিয়ের সুখকর বিষয়কে আমরা পরম প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই সংসার নানাবিধ ক্লেশের আকর-ভূমি। আমরা নিজেদের কর্ম্মদোষে এই সংসারে পতিত হইয়াছি; আমাদের কি কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সংসার-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের আপনারাই সুহৃৎ; অতএব এই সংসারে কিরূপে অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে, তাহা আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সনৎকুমার কহিলেন,—"হে রাজন্, মধুরিপু শ্রীহরির পাদ-পদ্মের গুণানুকীর্ত্তনে আপনার সুদুর্ল্লভা ও নিশ্চলা মতি আছে।

এইরূপ মতি হইতেই অন্তরাত্মার বিষয়বাসনারূপ মল বিধৌত হয়। শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, ভগবানের সেবায় নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সেবা এবং পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে সেই রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধন-রূপাদিতে আসক্ত ও ইন্দ্রিয়ের সুখ-ভোগে প্রমত্ত অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের অভিলষিত অর্থ-কামাদি পরিত্যাগ, নির্জ্জনবাসে অভিরুচি—এই সকল দ্বারা আত্মার সুখ হয়; কিন্তু **যে-স্থানে সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনে বাস করিবারও ইচ্ছা করিবেন না;** কেন না, তদ্দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়; কিন্তু কৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। অহিংসা, উপশমাদি-বৃত্তি, সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে সদাচারের অনুষ্ঠান, মুকুন্দের চরিত্র-পর্য্যালোচনা, ইন্দ্রিয়-দমন, ভোগবাসনা-পরিত্যাগ, হরির উদ্দেশ্যে ব্রতাদি-নিয়ম-পালন, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, নিজের ভোগ-বিষয়-লাভে ও তদ্রক্ষণে চেষ্টা-শূন্যতা, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা এবং ভগবদ্ভক্তগণের কর্ণের ভূষণ-স্বরূপ শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপ অনাত্মবস্তু প্রপঞ্চে বৈরাগ্য ও নির্গুণ-পরব্রহ্মে সহজেই পরমা রতি উদিত হইয়া থাকে। আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই দেহাদি অন্যান্য বস্তু প্রিয় হয়। সেই আত্মা বিনষ্ট হইলে তদপেক্ষা জীবের গুরুতর ক্ষতি আর কি হইতে পারে? ধন ও ভোগ্য-বিষয়াদির চিন্তাই জীবের সকল পুরুষার্থ-

নাশের মূল, যেহেতু তদুভয়ের চিন্তা দ্বারা জীব পরোক্ষ ও অপ-রোক্ষানুভূতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি-সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে ভক্তগণ যেরূপ কর্ম্ম-বাসনাময় হৃদয়ের গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা করুন। ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রকে যোগাদির দ্বারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র পার হইবার ভেলা-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণ তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্, আপনি সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই দুঃখময় সুদুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।”

পৃথু মহারাজ কহিলেন,—“হে ভগবন্, দীনদয়াল শ্রীহরি পূর্ব্বেই আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই ভগবদনুগ্রহ-সম্পাদনের জন্যই আপনাদের আগমন। আমি আপনাদিগকে আর কি দক্ষিণা দিব, যেহেতু আমার দেহ এবং এই রাজ্যাদি আপনাদের ন্যায় সাধুগণের প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ। ভৃত্য রাজাকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত যেরূপ তাম্বূলাদি প্রদান করে, তদ্রূপ আমিও প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও পরিচ্ছদাদির সহিত গৃহ, রাজ্য, সেনা, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।”

মহারাজ পৃথু ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অপ্রাকৃত ভগবান্‌কে সকল কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা জানিয়া কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান দূর করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া এবং সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কখনও বিষয়ে আসক্ত হন নাই। তিনি বাৎসল্যে মনু, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে পুত্র-হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক কেবল-মাত্র স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গমন করিলেন। তিনি কখনও কন্দমূল ও ফল, কখনও শুষ্কপত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করিয়া কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করেন। শেষে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্যই তিনি এরূপ অত্যুত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ পৃথু ঐরূপ শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সেবার জন্য যত্নশীল থাকায় অচিরেই তাঁহার শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল।



রাজা প্রাচীনবর্হিঃ

বৈষ্ণব-সম্রাট্ পৃথুর বংশে কর্ম্মবীর প্রাচীনবর্হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতলকে 'প্রাচীনাগ্র', কুশের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রাচীনবর্হির মহিষী শতদ্রুতি। তাঁহার গর্ভে দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা 'প্রচেতাঃ' নামে বিখ্যাত। প্রাচীন-বর্হিঃ পুত্রগণকে তপস্যা করিবার জন্য রাজ্য হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনবর্হির চিত্ত কর্ম্মের প্রতি আসক্ত ছিল, ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহার নিকট কৃপা পূর্ব্বক আগমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাচীনবর্হিঃ নারদকে জিজ্ঞাসা করেন,—"গৃহাসক্ত ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে; সেজন্যই তাহারা কাম্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সংসারে বিচরণ করে, কখনই যথার্থ পরমার্থ লাভ করিতে পারে না। তাহাদের মঙ্গলের উপায় কি?"

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে তাঁহার দ্বারা যজ্ঞে নিহত সহস্র-সহস্র পশুকে দেখাইয়া বলেন,—"হে রাজন্! আপনি নির্দ্দয় হইয়া আপনার যজ্ঞে যে সহস্র-সহস্র পশু হত্যা করিয়াছেন,

উহাদিগকে যে পীড়ন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া উহারা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। উহারা লৌহ-যন্ত্রময় শৃঙ্গদ্বারা অবিলম্বে আপনাকে ছিন্নভিন্ন করিবে। এই সময় পুরঞ্জনের একটি পুরাতন উপাখ্যান শ্রবণ করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলকর। আপনি তাহাই শ্রবণ করুন।"

'পুরঞ্জন' নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ও কার্য্য কাহারও বিদিত ছিল না। পুরঞ্জন বিষয়ভোগের লালসায় পৃথিবীর যাবতীয় পুরের (দেহের) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনটিই তাঁহার কামনা-সিদ্ধির উপযোগী দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে একদিন হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে নরদ্বারযুক্ত একটি পুর (মনুষ্য-শরীর) তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ পুরটি (দেহটি) প্রাচীর (ত্বক্) উপবন (বাহ্য-বিষয়), অট্টালিকা (মুখ), পরিখা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ) গবাক্ষ (লোমকূপ) ও বহির্দ্বার (চক্ষুঃ) দ্বারা সুশোভিত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় (পিত্ত, কফ, বাত—এই ত্রিধাতুকাত্মক) চূড়াযুক্ত গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। উপবনে বিবিধ হিংস্র জন্তুর বাস থাকিলেও উহাদের স্বভাব মুনিগণের ন্যায় হিংসাবিহীন ছিল (পুরঞ্জন নামক জীবের কর্ম্মজনিত পুণ্যহেতু তাঁহার ভোগ্য বিষয়-সমূহ নিষ্কপট ছিল)। অতএব ঐ সকল জন্তুর ভয়ে বনে প্রবেশ করিতে কেহই ভীত হইত না। পুরঞ্জন (জীব) দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দরীকামিনী (বিষয়বিবেকবতী বুদ্ধি) যদৃচ্ছা-

ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উপবনে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সেই রমণীর সহিত দশ জন ভৃত্য (দশটি ইন্দ্রিয়) ছিল। পঞ্চবৃত্তিরূপ পঞ্চমুণ্ডবিশিষ্ট (প্রাণ) সর্প ঐ কামিনীর শরীর-রক্ষক-স্বরূপ তাহার সঙ্গে ছিল। উহারা প্রত্যেকেই শত শত নায়িকার (বৃত্তির) পতি।

ঐ যুবতী (জীবমোহিনী অবিদ্যা) তাঁহার স্বামী (উপভোগ-কারী) অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐ যোড়শীর কটাক্ষ নিশিত বাণের ন্যায়। বীর (ভোগে উৎসাহী) পুরঞ্জন (জীব) সেই কামিনীর কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ হইয়া সেই সুন্দরীকে সম্ভাষণ করিলেন, কামিনী-কটাক্ষে ঐ বীর অধীর হইয়া পড়িলেন। কামিনীও মোহিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থানই আমার যোগ্য বসতিস্থল। তুমি আমার ভাগ্যফলে এই স্থানে আগমন করিয়াছ। দেখিতেছি, তুমিও আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখ অভিলাষ করিতেছ। আমি যে-সকল ভোগ্যবস্তু তোমাকে প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি উপভোগ কর। তুমি নবদ্বারযুক্ত এই পুরীতে শত-বৎসরকাল বাস কর।" এইরূপে পুরঞ্জন একশত বৎসর কামিনীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া বিবিধ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গেলেন।

একদিন সেই পুরঞ্জন একটি বৃহৎ ধনু (কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিনিবেশ) হস্তে গ্রহণ করিয়া, স্বর্ণময় কবচ (রজোগুণের আবরণ) ধারণ ও পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণীর (অনন্ত ভোগ-বাসনা-রূপ অহাঙ্কারোপাধি) বন্ধন করিয়া একটি রথে (স্বপ্নদেহে)

পঞ্চ 'প্রস্থ' (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়) নামক বনে গমন করিলেন। ইন্দ্রিয়াধিপতি 'মন' নামক সেনাপতি পুরঞ্জনের অনুগমন করিলেন। পুরঞ্জন স্ত্রীকে (বিবেকবতী বুদ্ধিকে) পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ার লালসায় (বিষয়ভোগ-লালসায়) ধনুর্ব্বাণ (রাগ-দ্বেষ ও 'আমিই কর্ত্তা', 'আমিই ভোক্তা' অভিমান) গ্রহণ-পূর্ব্বক সদর্পে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজা পুরঞ্জন (জীব) অনেক পশু হত্যা করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় (দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনায়) কাতর হইয়া পড়িলেন ও গৃহে (ধর্ম্মপথে) প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় প্রথমে মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। পরে পত্নীকে অনাবৃত ভূমিতলে দেখিতে পাইয়া তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া তাহাকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

পুরঞ্জন ধর্ম্মশীলা পত্নীতে আসক্ত হইয়া তাহার গর্ভে একাদশ শত পুত্র—(বিবেক-নির্ণয়, সংশয়াদি) ও একশত দশটি কন্যা (লজ্জা, উৎকণ্ঠা, চিন্তা প্রভৃতি) উৎপাদন করিলেন। পুরঞ্জনের ঐ সকল পুত্রের প্রত্যেকে আবার শত শত পুত্র উৎপন্ন করিল। এইরূপে পুরঞ্জন কুটুম্বাসক্ত-চিত্ত হইয়া আত্মার হিতসাধক ভগবানের সেবা-কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কামিনী-প্রিয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় জরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আধিব্যাধিরূপ যবনসেনা কালকন্যা জরার সহিত পুরঞ্জনের দেহরূপ পুরীকে আক্রমণ করিল। উহাতে পুরঞ্জনের 'শ্রী'ভ্রষ্ট হইল। পুরঞ্জন ঐরূপ 'শ্রী'-ভ্রষ্ট হইয়া এবং বিবেকাদিরূপ পুত্র,

গাম্ভীর্য্যাদিরূপ পৌত্র, মনঃ ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতি অমাত্যবর্গের প্রতিকূলাচরণ এবং বুদ্ধিরূপা পত্নীর প্রীতির অভাব লক্ষ্য করিয়া, মন্ত্রৌষধির দ্বারাও কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতে না পাইয়া, বিশেষতঃ কালকন্যা জরা ও যবন-সেনাগণের আক্রমণে তাঁহার পুরী বিধ্বংসিত দেখিতে পাইয়া ঐ দেহরূপা পুরী পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-সময়ে পুরঞ্জনের পূর্ব্ব-সখা একমাত্র হিতকারী শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হইল না। পুরঞ্জন যজ্ঞাদি-কর্ম্মে যে-সকল পশু হত্যা করিয়াছিলেন, উহারা পুরঞ্জনকে যমালয়ে দেখিতে পাইয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল। স্ত্রী-চিন্তা করিতে করিতেই পুরঞ্জন দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার স্ত্রীদেহ-লাভ হইল। তিনি যে-সকল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার ফলে স্বর্গাদি ভোগ করিবার পর কর্ম্মী বিদর্ভরাজের গৃহে তাঁহার কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মলয়ধ্বজ নামক এক কৃষ্ণভক্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। মলয়ধ্বজ বিদর্ভ-নন্দিনীর গর্ভে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিরূপা কন্যা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গরূপ সাতটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজর্ষি মলয়ধ্বজ (গুরুরূপ কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবত) শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্য নিজ-পুত্রগণের মধ্যে (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গগণের মধ্যে) পৃথিবী বিভাগ করিয়া (শ্রবনাদি ভক্তি-বিচিত্রতার ব্যবস্থা করিয়া) নিজে কুলা-চলে (ভক্তিপ্রদ একান্ত নির্জ্জন-স্থানে) গমন করিলেন। বিদর্ভ-নন্দিনীও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। পতিপরায়ণা (গুরুদেবনিষ্ঠ শিষ্য) বিদর্ভ-নন্দিনী ভক্তিযুক্ত

বৈরাগ্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক পরম ধর্ম্মজ্ঞ মলয়ধ্বজকে ভক্তি-সহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। মলয়ধ্বজ (শ্রীগুরুদেব) এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে বিদর্ভ-নন্দিনী স্বামীর অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন (শ্রীগুরুদেবের সমাধি দান করিয়া শিষ্য তাঁহার গুণ স্মরণ-পূর্ব্বক বিরহ-দাবাগ্নিতে দগ্ধ-দেহ হইয়া স্বীয় জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ ও নিত্যধামে শ্রীগুরুর সেবা-লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন)। সেই সময় কোন পূর্ব্বতন সখা (ভগবান্) ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া বিরহ-কাতরা বিদর্ভ-নন্দিনীকে (গুরুগতপ্রাণ শিষ্যকে) তাহার স্বরূপ (জীবের স্বরূপ), ভগবানের স্বরূপ, অবিদ্যা মায়ার স্বরূপ ও উহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা-লাভের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেন।

প্রাচীনবর্হিঃ শ্রীনারদকে এই পুরঞ্জন-উপাখ্যানের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ প্রত্যেকটি কথার প্রকৃত মর্ম্ম একে একে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—জীব কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচ নানাপ্রকার জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারা কখনই ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে না। শ্রীবাসুদেবে পরমা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জীবের নিত্য ও পরম-মঙ্গল-লাভ হয় না। সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথামৃত-প্রবাহের সেবা করিলেই জীবের শ্রীবাসুদেবে রতি উৎপন্ন হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় ও নানাবিধ অভাবের অনুভূতি অতি আনুষঙ্গিকভাবে চলিয়া যায়। কর্ম্মকাণ্ড কখনই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। শ্রীবিষ্ণুই বেদের মূল-পুরুষ। যাহা দ্বারা হরিতে মতি

হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। দেহে ও গৃহে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিতে চিত্ত-স্থাপনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুনামধারিগণ এই সকল আত্মতত্ত্ব অবগত নহে। সদ্‌গুরুই জীবের সংশয় ছেদন করিতে পারেন। শ্রীনারদের এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা প্রাচীনবর্হিঃ সমস্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কপিলাশ্রমে গমন করিয়া তথায় একান্তভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিলেন।



দশ-ভাই প্রচেতাঃ

প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র প্রত্যেকে 'প্রচেতাঃ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারী ছিলেন। পিতার আদেশে প্রচেতোগণ তপস্যা করিবার জন্য পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। পথে শিবের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। শম্ভু তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই সকল উপদেশে আমাদের সকলেরই বহু শিক্ষার বিষয় আছে। শিব বলিলেন,—"যে-ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। মানুষ স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া বহু জন্মে ব্রহ্মার পদবী

প্রাপ্ত হইতে পারেন ও তৎপরে আমাকে (শিবকে) লাভ করেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত, তিনি দেহান্তেই বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করেন। কাল বিশ্বকে ধ্বংস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের পদমূলে শরণাগত, কাল তাঁহাকে কখনই বশীভূত করিতে সাহসী হয় না। যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের পার্ষদ—বৈষ্ণব, যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তাঁহাদের সঙ্গ-লাভ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর রাজত্ব প্রভৃতি সামান্য ভোগের বিষয় দূরে থাকুক্, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান হয়। শ্রীহরির ভক্তগণের সঙ্গ-লাভ-সৌভাগ্যই ভগবদনুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাগবতগণের প্রতি যদি ভক্তিযোগের দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জীব অনায়াসে ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রচেতোগণ শিবের উপদিষ্ট বিষ্ণু-স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে দশহাজার বৎসর ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করেন। তাঁহারা 'রুদ্রগীত' নামক স্তবের দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই 'রুদ্রগীতে' ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি মহাদেবের শুদ্ধভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা সম্পুটিত রহিয়াছে।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দশহাজার বৎসর পরে প্রচেতোগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু দশ-ভাই প্রচেতার মধ্যে সকলেরই এক শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে একই প্রকার নিষ্ঠা এবং পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম অচ্ছেদ্য-প্রীতি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ দিলেন।

শ্রীবাসুদেব বলিলেন,—"যাঁহারা ভগবান্‌কে সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা জানিয়া তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন, তাঁহারাই সেবার অনুকূলে সমস্ত কার্য্য করেন; যাঁহারা ভগবানের কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেই সকল ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। যাঁহারা ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীহরি নবনবায়মানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।"

দশ-ভাই প্রচেতাঃ একসঙ্গে ভগবানের স্তব করিলেন—"হে ভগবন্! ভক্তিযোগের পথ-প্রদর্শক ও একমাত্র গতি ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন, তাঁহাদিগের অভীষ্টবর—ভগবানের কৃপা-প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যেরূপ অনায়াসে পারিজাত-পুষ্প লাভ হইলেও মধুপানকারী ভ্রমর পদ্মপুষ্প ব্যতীত অন্য পুষ্পের সেবা করে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীচরণ-কমল লাভ করিয়া সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবা-মধু ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্তগণের আর অধিক প্রার্থনার বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না।"

প্রচেতোগণ কেবল একটিমাত্র বর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনার মায়া-মোহিত হইয়া আমাদের নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারে আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত এই সংসারে ভ্রমণ করিব, সে-কাল-পর্য্যন্ত যেন আমাদের জন্মে-জন্মে আপনার গুণকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-লাভ হয়,—আমরা কেবল এই বরটী প্রার্থনা করিতেছি। ভগবানের নিত্যসঙ্গী ভাগবত-গণের অতি অল্পকালও সঙ্গের দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়,

তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষেরও তুলনা হইতে পারে না। এই জগতের তুচ্ছ রাজ্য-ভোগ-সুখের কথা আর কি বলিব ? শুদ্ধ-ভক্তগণের সমাজে আপনার বিশুদ্ধ-কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই সকল কথা-শ্রবণে ভোগেচ্ছারূপা তৃষ্ণার অনায়াসে শান্তি হয়। আপনার সেই সকল নিজ-জন তীর্থ-সকলকেও পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়তম সেবক শিবের ক্ষণকাল-মাত্র সঙ্গ-প্রভাবে এই সুদুশ্চিকিৎস্য * সংসার ও জন্ম-মৃত্যুরূপ রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য-স্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্! আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; আনুগত্যের দ্বারা গুরু, বিপ্র, বৃদ্ধ, আর্য্যগণকে নমস্কার করিয়াছি; বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ ও প্রাণিগণের হিংসা করি নাই; আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে বহুকাল-পর্য্যন্ত যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছি, সেই সকল সদাচার দ্বারা আপনার সন্তোষ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় বর।"

প্রচেতোগণের শুদ্ধভক্তির আদর্শ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জীবেরই মঙ্গল হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে সেই সকল দেবতার পূজা করে, তাহারা অবিধি-পূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।' এই স্থানে 'অবিধি' শব্দটী

---

* অতিশয় দুরারোগ্য অর্থাৎ যাহা চিকিৎসাদ্বারাও দূর করা অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা 'অবিধি', তাহা 'শুদ্ধা ভক্তি' নহে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সকলের মূল, সকল দেবতার প্রাণ, সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত গঙ্গাকে তাঁহার মস্তকে নিয়ত ধারণ করিয়া বিষ্ণুভক্তির আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন। মহাদেব তাঁহার শিরোভূষণ ও কণ্ঠভূষণরূপে সর্পরূপী অনন্তদেবকে সর্ববক্ষণ মস্তকে ও কণ্ঠে ধারণ করিতেছেন। তিনি পার্ব্বতীর সহিত সর্ব্বক্ষণ ইলাবৃত-বর্ষে সঙ্কর্ষণ রামের নাম গান করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন। প্রচেতোগণ সেই কৃষ্ণ-প্রিয়তম শিবকে গুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিবকে স্বতন্ত্র ভগবান্ অর্থাৎ শিবই সাক্ষাৎ 'বিষ্ণু', কেবল নাম ও রূপ ভেদমাত্র,—এইরূপ অবৈধ ও অদৈব-মতবাদ কখনও গ্রহণ করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তির আদর্শ।

দশ-ভাই প্রচেতাঃ ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আদেশে বৃক্ষপ্রদত্ত 'মারিষা' নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ শিবের চরণে অপরাধ-ফলে মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচেতোগণ বহু বৎসর সংসারাশ্রমে অবস্থান করিবার পর পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতটে—যে-স্থানে 'জাজলি' নামক ঋষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,—"হে প্রভো! শ্রীগুরুদেব শিব ও ভগবান্

শ্রীহরি আমাদিগকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা গৃহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদিগকে আপনি পুনরায় জ্ঞানোপদেশ করুন।" তখন নারদ দশ ভাইকে কৃপা করিয়া এই উপদেশ দিলেন,—

"যে জন্ম দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবা হয়, সে-জন্মই জন্ম; যে-সকল কার্য্যের দ্বারা ভগবানের সেবার আনুকূল্য হয়, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম; যে আয়ুর্দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই পরমায়ুঃ; যে মনের দ্বারা ও যে বাক্যের দ্বারা ভগবানের সেবা হয়, তাহাই শুদ্ধ মন ও প্রকৃত বাক্য। শ্রীহরির সেবা ব্যতীত জন্ম, বেদোক্ত কর্ম্ম ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুতেই বা ফল কি? শ্রীহরির সেবা ব্যতীত বেদান্তাদি-শ্রবণ, তপস্যা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি বাক্যবিলাস, নানা শাস্ত্রের অর্থ অবধারণ করিবার সামর্থ্য, সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়-পটুতা—এই সকলের দ্বারাই বা কি ফল? অষ্টাঙ্গ-যোগ, জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, বৈরাগ্য ও যাবতীয় সাধন, যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তোষণ না হয়, সেই সকলের দ্বারাই বা কি ফল? সকল প্রাণীর আত্মা—শ্রীহরি। তিনি এতদূর দয়াময় যে, নিজের আত্মা পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া দেন। তিনি পরমানন্দ-স্বরূপ। যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল-সেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত থাকে; প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়; সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারাই সমস্ত দেবতা ও পিতৃ-পিতা-

মহাদির পূজা হইয়া থাকে। মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ আর পৃথগ্‌ভাবে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্পাদিতে জল সেচন করিতে হয় না, বা প্রাণে আহার প্রদান করিলে পৃথগ্‌ভাবে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতিতে খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ সর্ব্বদেবতার মূল ও প্রাণস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিলে পৃথগ্‌-ভাবে আর অন্য দেবতাদের পূজা করিতে হয় না। শুদ্ধভক্তগণ এইজন্য সর্ব্বমূল ভগবান্ অচ্যুতেরই সেবা করেন।

সাধুগণের হৃদয়ে কোন কামনা নাই। তাঁহাদের আত্মা নির্ম্মল। তাঁহারা যখন ভগবান্‌কে ডাকেন, তখন সেই ডাকে ভগবান্ সাড়া দেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে আসিয়া বাস করেন। শ্রীহরি তাঁহার নিজ-জনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সেই স্থান হইতে আর অন্যত্র গমন করেন না। যে-সকল নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই প্রিয় ও ভক্তিকেই সুখদ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করে, শ্রীহরি সেই সকল কুমনীষী ব্যক্তির পূজা কখনই স্বীকার করেন না।”

শ্রীনারদের মুখে শুদ্ধভক্তিময় এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া দশ-ভাই প্রচেতাঃ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।



ভরত ও রন্তিদেব

অতি প্রাচীনকালে ঋষভদেব নামে এক রাজা ছিলেন। এই ঋষভদেব ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার মহিষীর নাম—জয়ন্তী। ঋষভদেবের একশত পুত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বে লক্ষণানুসারে বর্ণ বা জাতি নিরূপিত হইত। এখন যেরূপ ব্রাহ্মণের পুত্রকে 'ব্রাহ্মণ' ও শূদ্রের পুত্রকে 'শূদ্র'ই বলিতে হয়, পূর্ব্বে সকল ক্ষেত্রে তাহা হইত না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্রেও ব্রাহ্মণের লক্ষণ থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিগণিত হইতেন; আবার ব্রাহ্মণের পুত্রে শূদ্রের লক্ষণ দেখা গেলে তিনি 'শূদ্র' বলিয়াই গণ্য হইতেন, তাঁহাকে আর 'ব্রাহ্মণ' বলা হইত না।

নাভির পুত্র ঋষভদেব। নাভি ক্ষত্রিয় ছিলেন। ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে দশ জন ক্ষত্রিয়, নয় জন পরমহংস বৈষ্ণব ও একাশী জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যে দশ জন ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভরত। তাঁহার নাম হইতে এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশের নাম ছিল—অজনাভবর্ষ।

ঋষভদেব পুত্রদিগকে সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা পুত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিবেন, ঋষভদেবের উপদেশে * তাঁহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

* শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়ে পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ লিখিত আছে

ঋষভদেব পুত্রগণকে কহিলেন,—“কুকুর, শূকর প্রভৃতি জন্তু, যাহারা বিষ্ঠা ভোজন করে, তাহারাও ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য লালায়িত ; মনুষ্যগণের তাহা কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সেবাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহাপুরুষগণের সেবাই ‘মুক্তির দ্বার’। যাঁহারা জগতের কোন বস্তুতে আসক্ত নহেন, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনই যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য, তাঁহারাই মহৎ। দেহে আসক্তি,—‘আমি ও আমার’ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সেইরূপ মহতের সেবা করিবে। অন্ধ ব্যক্তিকে ভ্রান্ত-পথে চলিতে দেখিয়া যে-ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক না করে, সে যেরূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সেইরূপ এই সংসারের লোক, যে দেহাসক্তির পথে চলিয়াছে, তাহা হইতেও যে-ব্যক্তি সতর্ক না করে, সে অত্যন্ত নির্দ্দয়। ভক্তির উপদেশ দ্বারা যিনি মৃত্যুরূপ সংসার হইতে জীবকে রক্ষা করিতে না পারেন, সেই গুরু—‘গুরু’ নহেন, সেই স্বজন—‘স্বজন’ নহেন, সেই পিতা—‘পিতা’ নহেন, সেই জননী—‘জননী’ নহেন, সেই দেবতা—‘দেবতা’ নহেন। এজন্যই পূর্ব্বকালে মহাত্মা বলি ‘গুরু’-নামধারী শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে, প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে, ভরত জননী কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গরাজা দেবতাগণকে, ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাদের পতি যাজ্ঞিক-বিপ্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন ; কেন না, ইঁহারা ভগবানের সেবায় বাধা দিয়াছিলেন।”

পিতার নিকট হইতে ভরত এই সকল শিক্ষা লাভ করিয়া কিছুকাল রাজ্য পালন করিয়াছিলেন এবং পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ

করিয়া পুলহাশ্রমে গমন-পূর্ব্বক ভগবান্ 'বাসুদেবে'র সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আশ্রমটি গণ্ডকী-নদীর তীরে বিরাজিত ছিল। ঐ নদীতে প্রচুর পরিমাণে শ্রীনারায়ণ-শিলা পাওয়া যাইত। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে ভরত একাকী থাকিয়া নানাপ্রকার পুষ্প, পত্র, তুলসী, ফল-মূলাদির দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের জন্য অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় শরীরে কম্প, অশ্রু, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারও লক্ষিত হইতে লাগিল।

একদিন তিনি নদীর তীরে বসিয়া 'হরিনাম' জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গর্ভবতী হরিণী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ নদীর তীরে আগমন করিয়া জলপান করিতে থাকিল। কিছু দূরে একটী সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরিণী প্রাণভয়ে লম্ফ দিয়া নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে হরিণীর গর্ভপাত হইল ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। হরিণীর গর্ভস্থ শাবকটি নদীর স্রোতে ভাসিতে লাগিল। ভরত মন্ত্র জপ করিতে করিতে নদী-তীরে বসিয়া এই সকল লক্ষ্য করিতেছিলেন।

এমন কোন্ পাষাণ-হৃদয় আছে, যাহা এইরূপ দৃশ্যে বিগলিত না হয়? ভরতেরও তাহাই হইল। ভরত হরিণ-শিশুটিকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের নাম-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবং-বিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে।"—(ভাঃ ৫।৮।১০) সকল প্রকারে জাগতিক বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইলেও দীনজনের বন্ধু আর্য্য

সাধুগণ দীনব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য তাঁহাদের গুরুতর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া থাকেন।” এইরূপ বিচার করিয়া ভরত নিঃসহায় হরিণ-শিশুটীকে নদীর স্রোতঃ হইতে উদ্ধার করিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত উহার সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা মৃগের কথা ভাবিতে ভাবিতে, মৃগের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুকালে তিনি দেখিতে পাইলেন যেন সেই মৃগশিশু তাঁহার নিজের পুত্রের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে। ঐ হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁহার চিত্ত এতটা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভরত গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াও হরিণ-শিশুরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভরত মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে হরিণ-দেহ লাভ করিলেন।

ভরতের একটি শুভ-লক্ষণ ছিল যে, তিনি মায়াবাদিগণের ন্যায় জীবে নারায়ণ-বুদ্ধি করেন নাই, জীবকে ঈশ্বর ভাবেন নাই, দরিদ্রকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া কল্পনা করেন নাই, তাই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপ ও ভগবানের সেবা-স্মৃতি উদিত হইল। তিনি অনুশোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“অহো! কি কষ্ট! আমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি! আমি যে-জন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে আসিয়াছিলাম, একান্তভাবে ভগবানের নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরন প্রভৃতি ভক্তিযোগে বহুকালে ভগবান্ ‘বাসুদেবে’ চিত্ত স্থির করিয়াছিলাম, তাহা হরিণ-শিশুর সঙ্গে সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। আমি কি মূর্খ!”

ভরতের যখন এইরূপ সদ্‌বুদ্ধির উদয় হইল, তখন তিনি হরিণী মাতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালঞ্জর পর্ব্বত হইতে পুলস্ত্যপুলহাশ্রমে গমন করিলেন। এখানে তিনি মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পাছে পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করিয়া সঙ্গদোষে আবার পতন হয়, এই ভয়ে তিনি কোন সাংসারিক ব্যক্তির সঙ্গেই মিশিলেন না এবং লোকের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যে পাগল ও 'হাবা-বোবা'র ন্যায় থাকিয়া অন্তরে ভগবানের সেবায় মগ্ন রহিলেন।

একদিন গভীর রাত্রিতে ভরত শস্য-ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন ; এমন সময় এক দস্যু-সর্দ্দারের কতকগুলি লোক আসিয়া জড়-ভরতকে 'ভদ্রকালী-পূজা'য় বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। ডাকাতেরা দেবীর নিকট জড়ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হইলে দেবী প্রতিমা হইতে ভীষণ-মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া ডাকাতদিগের খড়্গের দ্বারা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া ভক্তকে রক্ষা করিলেন।

এক সময় সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার একজন শিবিকা-বাহকের অভাব হওয়ায় জড়ভরতকে 'খাজাবোকা'র মত দেখিয়া তাঁহাকেই বল-পূর্ব্বক শিবিকা-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অভিমানশূন্য ভরত কোন প্রতিবাদ না করিয়া শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। কিন্তু পাছে পদাঘাতে কোন প্রাণী নিহত হয়, এই ভয়ে ভরত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন ; ইহাতে অন্যান্য শিবিকা-বাহকদিগের গতির

সহিত ভরতের গতি অসমান হওয়ায় শিবিকাটি আন্দোলিত হইতে লাগিল ; তাহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া এবং নূতন বাহক ভরতকেই দোষী জানিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও দণ্ড-প্রদানের ভয় দেখাইলেন। রাজার অহঙ্কার-পূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া ভরত গভীর তত্ত্বকথা বলিলেন। একজন নির্ব্বোধ শিবিকা-বাহক এই-রূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বকথা বলিতে পারে দেখিয়া রাজা চমকিত হইলেন এবং তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি ভরতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কারণ, মহতের অবমাননা করিলে শিবের ন্যায় ব্যক্তিও বিনষ্ট হয়। রহূগণ রাজার প্রতি ভরতের তত্ত্বো-পদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। *

ভরত রাজা রহূগণকে বলিলেন,—"এই সংসার-অরণ্য অতি দুস্তর। জীব মায়ার বশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। এই অরণ্যে ছয়টী ইন্দ্রিয়রূপ দস্যু ও স্ত্রী-পুত্রাদি মাংস-শোণিতাশী শৃগাল-কুক্কুরতুল্য প্রাণী আছে। ব্যাঘ্রগুলি যেরূপ মেষকে হরণ করে, সেইরূপ এই ভবাটবীতে শৃগালতুল্য পুত্র-কলত্রাদিও 'তুমি আমার পিতা, তুমি আমার স্বামী', এইভাবে সেই গৃহসদৃশ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবের চিত্তকে অপ-হরণ করে। এ স্থানে কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি জঠরানলে পীড়িত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। এ স্থানে কেবল দণ্ড ও ত্রিতাপ। যে-সকল বলবান্ ব্যক্তি দিগ্‌গজদিগকেও জয় করিতে পারে, তাহারাও 'এই ভূমি আমার' এইরূপ অভিমান-

* শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ, দশম অধ্যায় হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

৭—

বশতঃ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করিয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে। কেহ বা স্ত্রীসঙ্গ ও তাহাদের মুখ-বাক্য-শ্রবণাদির সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে পুত্রমুখ দর্শন করিবার অভিলাষ করে, কখনও বা কালচক্র-ভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চক ও কু-বুদ্ধি-বিশিষ্ট পাষণ্ডগণের সহিত মিলিত হয়। হে রহূগণ! আপনি বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিসেবায় অভিনিবিষ্ট হউন।"

রাজা রহূগণ মহাভাগবত ভরতের নিকট সংসারের অনিত্যতা ও শ্রীহরি সেবাই পরম-মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজর্ষি ভরত যৌবনেই শ্রীভগবানের সেবা-লালসায় সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যাজ্য বিষয়-সমূহকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অধিক কি, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষও তাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; তিনি শ্রীনারায়ণের সেবাকেই সার করিয়াছিলেন। দরিদ্রে, পশুতে কিংবা জীবে 'নারায়ণ-বুদ্ধি' যে অপরাধজনক ও আত্মহত্যাকারক, ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাই তিনি মৃগ-শরীর ত্যাগ করিবার সময় "মায়াধীশ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিতেছি"—এই বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৪।৪৫

(ভরত) মৃগদেহ পরিত্যাগ-কালে "শ্রীহরি নারায়ণকে নমস্কার" (আমি নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিতেছি)—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্রের সঙ্গে আর একজন মহাত্মার চরিত্রও আচার্য্যগণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নাম—'রন্তিদেব'। তিনিও একজন মহাদানশীল রাজা ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, কিন্তু একজন পরম-বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার অর্থ-সম্পত্তি ভগবানের ভক্তগণের সেবার জন্যই নিযুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া অপরকে বিষ্ণুর প্রসাদের দ্বারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত করিতেন। সময় সময় এইরূপ হইত যে, রাজা সমুদয় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন; এমন কি, জল পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিক-কাল গত হইত। তিনি প্রাণি-নির্ব্বিশেষে সকলকে শ্রীভগবানের প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া তাহাদের যাহাতে ভগবানে ভক্তির উদয় হয়, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।১২

আমি ভগবানের নিকট হইতে অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত শ্রেষ্ঠগতি অথবা মোক্ষ প্রার্থনা করি না; কিন্তু যেন সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, তাহা দ্বারা যেন অন্য জীব দুঃখরহিত হয়।

রন্তিদেবের এইরূপ পরদুঃখে কাতর-হৃদয় দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং বিষ্ণুমায়া বহু লোভনীয় বস্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সকলের প্রতি দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তির সহিত চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। *

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রের তুলনা করিয়া একটি বিশেষ মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কেবল প্রানীর দেহের উপকার করিবার জন্য শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করায় ভরতের অসুবিধা হইয়াছিল। জীবের আত্মার উপকার করিবার চেষ্টাই প্রকৃত মঙ্গলের পথ। জীব ভগবানের নিত্য-সেবক। সেই সেবা ভুলিয়া যাওয়ায় তাহার যত দেহের ও মনের ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। জীবকে ক্লেশ হইতে সত্য সত্য উদ্ধার করিতে হইলে সকল ক্লেশের বীজ অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়াকে উন্মুলিত করিতে হইবে। ভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই সেই অবিদ্যার বিনাশ হয় ও জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম জাগরিত হয়।

* স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।১৬

অর্থাৎ আসক্তিরহিত ও বিষয়ভোগের বাসনা রহিত হইয়া রন্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে নমস্কার ও কেবলমাত্র ভগবান বাসুদেবে ভক্তিসহকারে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

যেমন, ধন-লাভ করিলে দরিদ্রতা আপনিই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানের নিত্য সেবা-ধন লাভ করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিদূরিত হয়। রন্তিদেব কেবল প্রাণীর দুঃখে কাতর হইয়া লোকের দেহের উপকারের জন্য চেষ্টা করেন নাই। তিনি ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তির সহিত চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবতাগণ তাঁহার নিকট বহু প্রলোভন আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে মুগ্ধ হন নাই; তিনি মুক্তিসুখ ও নিজের ভোগ-কামনা করেন নাই। সকল জীব ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউক, এজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা সত্য-সত্যই মঙ্গল-লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয়, নিজের ও সকল জীবের যাহাতে শ্রীহরির কথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ হয়, জগৎ হইতে হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ যাহাতে দূরীভূত হয়, সকলে যাহাতে কৃষ্ণসেবা-ধনে ধনী হইতে পারেন, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। দেহের ও মনের সাময়িক উপকার করিয়া কেহ জীবের নিত্য অভাব মোচন করিতে পারে না। হরিসেবা-ধনে ধনী হইলে সমস্ত অভাবই চলিয়া যায়।



অজামিল

কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে এক শূদ্রা কামিনীকে বিবাহ করে। সেই শূদ্রার সঙ্গে অজামিলের সমস্ত সদাচার বিনষ্ট হয়। অজামিল ক্রমশঃ নানাবিধ অসদুপায় ও জঘন্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই প্রকার জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার অষ্টাশীতি বৎসর চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র জন্মিয়াছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রটী অতিশয় শিশু। তাহার নাম ছিল—'নারায়ণ'। কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতা-পিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ অজামিল সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুতে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাহার বালকোচিত চেষ্টা-সমূহ দর্শন করিতে করিতে পরম আনন্দ অনুভব করিত। পান ও আহারকালে যাহা ভাল লাগিত, উহারই অংশ এই পুত্রকে দিত। এইরূপে বালকের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন সে তাহার 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের বিষয়ই ভাবিতে লাগিল। অজামিল সেই সময়ে দেখিতে পাইল, তিন জন অতি ভীষণাকৃতি পুরুষ তাহার (অজামিলের) জীবাত্মাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। দেখিবা-মাত্রই

অজামিল বিহ্বল-চিত্ত হইয়া পড়িল। সেই সময় তাহার পুত্র নারায়ণ কিছু দূরে খেলা করিতেছিল। অজামিল পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আসন্নমৃত্যু অজামিলের মুখে নিজ-প্রভুর নাম-শ্রবণ ও উহাকে অপরাধশূন্য নামাভাস বিবেচনা করিয়া বিষ্ণু-পার্ষদগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমদূতগণ অজামিলের হৃদয়ের মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। তখন যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণকে বলিল,—"ধর্ম্মরাজ যমের আজ্ঞায় তোমরা বাধা প্রদান করিতেছ কেন? তোমরা কে? তোমরা কাহার অনুচর? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? আর কি জন্যই বা এই পাপিষ্ঠ অজামিলকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছ? দেখিতেছি, তোমরা সকলেই মনোহর-মূর্ত্তি, আজানুলম্বিত-চতুর্ভুজ। তোমাদের জ্যোতির দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মরাজের চর। তোমরা আমাদিগকে কি কারণে নিবারণ করিতেছ?"

বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া গম্ভীরস্বরে যমদূতগণকে বলিলেন, —"যদি তোমরা ধর্ম্মরাজেরই আদেশ-পালক হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ ও অধর্ম্মের লক্ষণ বল। কি প্রকারে দণ্ডধারণ করিতে হয়, দণ্ডের যোগ্য-পাত্রই বা কে, তাহা আমাদিগকে বল।" যমদূতগণ বলিল—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই 'ধর্ম্ম'; তাহার বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ। কর্ম্মিগণের পুণ্য ও

পাপ, উভয়ই সম্ভব ; কারণ, তাহাদের ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। দেহধারিব্যক্তি ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এই পৃথিবীতে যে-ব্যক্তি যে-পরিমাণ ও যে-প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্ম-তুল্য যমদেব নিজের পুরীতে থাকিয়াই জীবের পূর্ব্বকৃত আচরণ দেখিতে পান এবং তদনুরূপ বিচার করিয়া থাকেন। অজামিল প্রথমে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সৎস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। কিন্তু দৈবাৎ কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার অধঃপতন হয়। পরিশেষে সে সদসদ্-বিচারহীন হইয়া নানাপ্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। সে সেই সকল পাপের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, এজন্য আমরা তাহাকে দণ্ডধারী যমের নিকট লইয়া যাইব। তথায় সে পাপানুরূপ দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"হায়! হায়! পশুর মত অবোধ ও অবল প্রাণিগণ যে-সকল সাধু-মহাত্মার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত, যমাদির মত সেই সাধুগণের মধ্যেও যদি এইপ্রকার অবিচার দেখা যায়, তাহা হইলে জীব আর কাহার শরণ লইবে ? যে-ব্যক্তি দণ্ডের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাঁহার প্রতিও এখন দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে 'নারায়ণ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া কেবল এক জন্মের নহে, কোটি-জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাভাস সর্ব্ববিধ পাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। যে-ব্যক্তি

ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু 'এই ব্যক্তি আমার নিজ-জন, ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।"

শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের সাময়িক শান্তি হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে পাপীর পাপবৃত্তির মূল ধ্বংস হয় না, পুনরায় সে পাপে রত হয়। কিন্তু হরিনামের আভাসেই পাপের মূল উৎপাটিত হয়; হৃদয় পাপ-প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়। যে-কোন প্রকারে যে-কোন অবস্থায় হরিনাম উচ্চারিত হইলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। তাহা হইতেও পরম মঙ্গল-লাভ ও মহা অমঙ্গল দূর হয়। তপস্যা, ব্রত, দানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই এই নামাভাসের ন্যায় হৃদয়ের মলিনতা দূর করিতে সমর্থ নহে।

পাপ করিলে এই পৃথিবীতে রাজার দণ্ড, লোকনিন্দা প্রভৃতি ভয় ও পরলোকে নরকের ভয় আছে। ইহা দেখিয়া, শুনিয়া ও জানিয়াও লোকে বিবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ সেই পাপকর্ম্ম ই করিয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বার্ষিক প্রভৃতি ব্রতকে কিরূপে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে? কখনও কেহ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার অন্য সময় পুনরায় সেইরূপ পাপই করিয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত হস্তি-স্নানের ন্যায় নিরর্থক। হস্তীকে অঙ্কুশাদির দ্বারা তাড়না করিয়া নদীতে অবগাহন করাইয়া উহার গাত্র ধৌত করিয়া দিলে সাময়িকভাবে উহার গাত্রের ময়লা দূর হয় বটে, কিন্তু তীরে উঠিয়াই সেই হস্তী শুণ্ডের দ্বারা পুনরায় সমস্ত শরীরে ধূলিকণা ছড়াইয়া থাকে।

যাহার হৃদয়ে পাপের প্রবৃত্তি আছে, তাহারও সেই দশা। যতই কঠোর প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া কেহ সাময়িকভাবে পাপ হইতে নিবৃত্ত হউক না কেন, তাহার পাপের প্রবৃত্তির মূল ধ্বংস না হওয়ায় সে-ব্যক্তি কিছুকাল পরে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে কখনও বিনাশ করা যায় না। পাপাচার-সমূহ যেরূপ কর্ম্ম, 'চান্দ্রায়ণাদি' প্রায়শ্চিত্ত-সমূহও সেইরূপই কর্ম্ম। অবিদ্যার বিনাশ না হইলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ অন্য পাপের অঙ্কুরোদগম হয়। অগ্নির দ্বারা যেরূপ বেণুগুল্ম (বাঁশের ঝাড়) বিনষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্তের একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য্য, বাহ্য ও অন্তরের ইন্দ্রিয়-সমূহের নিগ্রহ, দান, সত্যভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু ঐরূপভাবে বেণুগুল্ম বিনষ্ট হইবার সময়েও অগ্নি যেরূপ উহাদের মূলদেশকে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করিতে না করিতে প্রায়ই নির্ব্বাপিত হয় অর্থাৎ দগ্ধ করিতে পারে না; সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য, দান, শৌচ, তপস্যাদি ও পাপের মূল ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শ্রীবাসুদেব-পরায়ণ ভক্তগণ কেবলা ভক্তির দ্বারা অনায়াসে অতি আনু-ষঙ্গিকভাবে পাপকে সমূলে সংহার করেন। সূর্য্য উদিত হইলে যেরূপ আর কোথায়ও নীহার থাকিতে পারে না, সেরূপ কেবলা ভক্তির উদয় হইলে জীবের আর পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না। আলোক-দান সূর্য্যের মূল কার্য্য; কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শীতেরও বিনাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ কেবলা ভক্তির উদয়ে জীবের হৃদয়ে

প্রেমের আবির্ভাব হয় এবং গৌণফলরূপে সঙ্গে-সঙ্গেই অবিদ্যা ও পাপের প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাপ দুই প্রকার—(১) অপ্রারব্ধ ও (২) প্রারব্ধ। যাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে ও যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহা 'অপ্রারব্ধ পাপ'; উহা অনাদি ও অনন্ত। যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, উহা 'প্রারব্ধ পাপ'। এই প্রারব্ধ-পাপ-প্রভাবে নীচকুলে জন্ম প্রভৃতি হয়। পদ্মপুরাণে (১) ফলোন্মুখ, (২) বীজ, (৩) কূট ও (৪) অপ্রারব্ধ-ফল—এই চারিপ্রকার পাপের কথা আছে। 'ফলোন্মুখ' অর্থে প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টভাবে আরব্ধ বা যাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'বীজ' অর্থে—পাপ করিবার বাসনা-সকল বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতার কারণ; 'কূট' অর্থে—বীজত্বের উন্মুখতার কারণ; 'অপ্রারব্ধ-ফল' অর্থে—যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থাও আরব্ধ হয় নাই। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভার সঙ্গে-সঙ্গেই হিমরাশি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ-বিনাশ করিবার জন্য ভক্তির আভাসই যথেষ্ট। পাপী পুরুষ শুদ্ধভক্তের অনুক্ষণ সঙ্গ ও সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্যাদি দ্বারা নিশ্চয়ই সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত নদী মিলিত হইলেও মদ্যভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না; সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা-মহা প্রায়শ্চিত্ত নারায়ণের সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। এই

সংসারে যে-সকল ব্যক্তি একবারও কৃষ্ণের পাদপদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুরক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের ভগবানের প্রতি সেই রতির আভাসেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা যমদূত-গণকে দর্শন করেন না।

অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা নহে, হরিনামের আভাসে তাঁহার কোটি কোটি জন্ম-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। অধিক কি, তিনি মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পরম মঙ্গল হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন। যাহারা স্বুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য হরণ করে, যাহারা মদ্য পান করে, যাহারা ব্রাহ্মণের হত্যা, গুরুপত্নী-গমন, স্ত্রী-হত্যা, গো-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, রাজ-হত্যা ও অন্যান্য যে-সকল মহাপাতক আছে, তাহাও করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর নামের আভাসই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। কারণ, যে-ব্যক্তি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ভগবান্ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু ঐ সকল পাপ বা অসদাচার করিবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ নামরূপ অস্ত্রকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ যদি কেহ মনে করে, 'যে-কোন মহাপাতকই যখন নামের আভাস-মাত্রেই বিনষ্ট হয়, তখন আমি পুনঃ পুনঃ পাপ করিব ও নামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা উহার ক্ষালন করিয়া লইব।' তাহা হইলে সেই-রূপ বিচার অপরাধই বৃদ্ধি করিবে,—ইহাকে 'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি' বা 'অপরাধ' বলে। ঐ সকল ব্যক্তিকে কোনকালে হরিনাম

রক্ষা করেন না। ইহারা কপট ও অপরাধী। ইহারা মহাপাতকী হইতেও নিজের ও পরের অমঙ্গলকারী ও শ্রীনামের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধী। যিনি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার সহিত কপটতা ও দোকানদারী করিলে আর রক্ষা নাই।

অজামিল অনেক পাপ করিলেও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ঐরূপ কোনপ্রকার অপরাধ করেন নাই; এজন্য তাঁহার উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হইয়াছিল, নামের চরণে অপরাধ হয় নাই। 'ভগবান্ই আমার একমাত্র প্রভু; তিনি পূর্ণচেতন, আমি অনুচেতন জীব তাঁহার নিত্যদাস; আমি দেহ ও মন নহি; এই জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তি-শোধক কারাগৃহ'—এইরূপ জ্ঞানকে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলে। যে-পর্য্যন্ত গুরু-কৃপায় এইরূপ জ্ঞানের উদয় ও উপলব্ধি না হয়, সে-পর্য্যন্ত যে নামের উচ্চারণ করা যায়, তাহাই 'নামাভাস'। এই নামাভাস চারি প্রকার—(১) সঙ্কেত, (২) পরিহাস, (৩) স্তোভ ও (৪) হেলা। সঙ্কেত দুই প্রকার—জড়বুদ্ধিতে বিষ্ণুকে সঙ্কেত বা লক্ষ্য করিয়া নাম-গ্রহণ। অজামিলের এই 'সঙ্কেত নামাভাস' হইয়াছিল। তিনি প্রথমে পুত্র-বুদ্ধিতে নাম-গ্রহণ করিলেও তাহাতে ভগবান্ নারায়ণের নামের সঙ্কেত হইয়া পড়িয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিলেন। এই নামাভাস উদিত হইবার পর তিনি সংসারমুক্ত হইয়া সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে হরিভজন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার সঙ্কেত-নামাভাসে বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিতে গিয়া অন্য জড়বস্তু লক্ষিত হইয়া পড়ে। যেমন ম্লেচ্ছগণ 'হারাম'

শব্দে 'হা! রাম!' এইরূপ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিলেও অন্য একটী প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

'পরিহাস' করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণের উদাহরণ জরাসন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্তোভ'-শব্দে অগৌরব বা নিরর্থক-শব্দ বা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বুঝায়। শিশুপালের এই নামাভাস হইয়াছিল বলিয়া মহাজনগণ উক্তি করেন।

'হেলা' শব্দে অবজ্ঞা বুঝায়। বিষয়ী, বিধর্ম্মী বা অলস-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের এইরূপ নামাভাস সম্ভব হইতে পারে, যদি তাহাদের কোনপ্রকার অপরাধ না থাকে।

'সঙ্কেত' হইতে 'পরিহাস' কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত, পরিহাস হইতে 'স্তোভ' অধিকতর দোষপূর্ণ এবং স্তোভ হইতে 'হেলা' অধিকতর দোষাবহ। যত প্রকার সুকৃতি আছে, তন্মধ্যে নামাভাসই জীবের সর্ব্বপ্রধান সুকৃতি বলিয়া গণ্য। যাবতীয় পুণ্যকর্ম্ম, ব্রত, যোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য অপেক্ষাও নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফল-প্রদ। নামাভাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, পাপের বিনাশ, সংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাভ ও নিত্যমঙ্গলের উদয় হয়।

দ্বিতীয় প্রকার নামাভাস বা প্রতিবিম্ব-নামাভাস অপরাধের মধ্যে গণ্য। কোনও কোনও সময় জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক সম্মুখবর্ত্তী পদার্থে উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এরূপ উদাহরণকে প্রতিবিম্বিত নামাভাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নামজ্যোতিঃ মায়াবাদরূপ হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত

হইলে তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলা যায়। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস হয়, আর দুষ্ট জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্ব-নামাভাস প্রকৃত-প্রস্তাবে নামাভাস-পদবাচ্য নহে, ইহা বস্তুতঃ নামাপরাধ। হৃদয়ে মায়াবাদ পোষণ করিয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে অনিত্য বা কল্পিত মনে করিয়া যে নাম-গ্রহণের অভিনয়, তাহাই প্রতিবিম্ব-নামাভাস বা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম (ষষ্ঠ) অপরাধ।

কোনও কোনও মহাজন বলেন, অজামিল যে দিন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিলেন বা নাম-করণ সংস্কারের সময় যখন সর্ব্বপ্রথমে পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত 'নারায়ণ' নামেই তাঁহার নামাভাস ও সর্ব্বপাপ নাশ হইয়াছিল। তৎপরে তিনি যে-সব নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম নাম-গ্রহণের নামাভাসের পরেও অজামিল পাপ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন নাই। তিনি একটি শূদ্রা দাসীতে আসক্ত হইয়া নানাপ্রকার পাপ-কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার সমাধানে কেহ কেহ বলেন, বৃক্ষের ফলোন্মুখ কার্য্য বহু পূর্ব্বে আরম্ভ হইলেও ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে। সেইরূপ অজামিলেরও সর্ব্বপ্রথম 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ-কালেই নামাভাস হইলেও তাঁহার দেহ-ত্যাগের সময় তাহার ফল সম্পূর্ণ-রূপে ফলিয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কেহ

কেহ হরিনামাক্ষরোচ্চারণ-মাত্রকেই নাম ও নামাভাসরূপে কল্পনা করে এবং নামোচ্চারণের পর যে-সকল পাপে প্রবৃত্তি ও দুরাচারাদি লক্ষ্য করা যায়, তাহাদিগকে বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল-ধারণ-কাল পর্য্যন্ত একটি ব্যবধান-মাত্র বিচার করিয়া নামের বলে পাপ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া থাকে। বস্তুতঃ সকলেই অজামিল নহেন। বহির্দৃষ্টিতে অজামিলের কদর্য্যানুষ্ঠানের সহিত যদি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের দুরাচারকে সমান বলিয়া গণনা ও অজামিলের উদাহরণের দ্বারা তাহা সমর্থন করা হয়, তবে শুদ্ধনামের উচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ অজামিল বা বিল্বমঙ্গলাদির দুরাচারের অনুকরণ করিয়া কেহ অনর্থযুক্ত ব্যক্তির দুরাচারকে সমর্থন করিতে গেলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হইবে। মুক্ত পুরুষগণের পক্ষে ঐ সকল তথাকথিত দুরাচার দোষের বিষয় না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা কখনই আদর্শ হইতে পারে না। এজন্য কোন কোন মহাজন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অজামিলের দেহ-ত্যাগ-সময়ে শেষ 'নারায়ণ' নাম-উচ্চারণকে 'নামাভাস' বলিলে সাধারণ ক্ষুদ্র জীবের আর অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবার কোন ছিদ্র থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ও শেষোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই। তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্তটীতে অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে অধিক সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীহরিনামে সর্ব্বশক্তিই নিহিত রহিয়াছে। উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদির দ্বারা আক্রান্ত, জরাদি রোগে পীড়িত, অথবা দণ্ডাদির দ্বারা আহত হইয়া

অবশেও যে-ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ গুরু পাপের গুরু ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাই বটে। কিন্তু হরিনামে ঐরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। ঐ নাম স্মরণ-মাত্রই পাপিগণ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপ-সমূহ বিনষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের মলিনতা অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তির দ্বারা চিত্ত সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানেই হউক, আর অজ্ঞানেই হউক, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে, তাহা উচ্চারণকারীর পাপসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেরূপ না জানিয়া অতিশয় শক্তিশালী ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ তাহার শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও 'শ্রীহরিনাম' নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুর পার্ষদগণ অজামিলকে যম-পাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ যমরাজের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন। এদিকে অজামিল প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিতে ভক্তিমান্

হইলেন। তিনি নিজের পূর্ব্বকৃত অন্যায় কর্ম্মসকলের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। নিজের প্রতি শত-শতঃধিক্কার প্রদান করিয়া তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—"দেহেতে আত্মবুদ্ধিই ভোগবাসনার মূল। ভোগ-বাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভকর্ম্মে আসক্তি, ইহাই জীবের বন্ধন। এই বন্ধন আমি ভগবানের সেবার দ্বারা মোচন করিব। শ্রীহরির মায়াই কামিনীরূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছিল। নরাধম আমি তাহারই দ্বারা যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতে-ছিলাম। বিষ্ণুজনের সঙ্গে ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ হইব না, মহা-মোহান্ধকারময় সংসারে আর পতিত হইব না। এইবার আমি দেহ ও গেহাদিতে 'আমার' বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব।"

ক্ষণমাত্র বৈষ্ণবগণের প্রভাবে অজামিলের সুদৃঢ় বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহরূপ যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রীভগ-বানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তথায় বিষ্ণুর পার্ষদ পূর্ব্বাগত সেই চারিজন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহা-দিগকে বন্দনা করিবার পরেই অজামিল হরিদ্বারের তীর্থে দেহত্যাগ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ভগবৎসেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

অজামিলের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যেন কেহ কেহ মনে না করেন, হরিনামের অতিস্তুতি করিবার জন্যই এই সকল কথা

কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, অনেকে বহুবার হরিনাম উচ্চারণ করে, তথাপি তাহাদের সংসার-বাসনা দূর হয় না, তাহারা পাপ, দুরাচার হইতে মুক্ত হয় না; তবে কি করিয়া বুঝা যাইবে যে, হরিনামে এতটা শক্তি আছে এবং অজামিলের দৃষ্টান্ত সত্য ? অতএব নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হরিনামকে অতিস্তুতি করিবার জন্য এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

এইরূপ বিচারকে নামে অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি কল্পনা বলা হইয়াছে। যাহারা নাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করে, যাহারা অন্যান্য সাধন-প্রণালীর সহিত নাম-সংকীর্ত্তনকে এক মনে করে অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তন বহু সাধন-প্রণালীর অন্যতম প্রণালী-বিশেষ, ইহা বিচার করে, তাহাদের ন্যায় অপরাধী আর নাই; তাহাদের কোনদিন হরিনামে রতি হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইত্যতো নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্ব-মুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশঙ্ক্যঃ।"

অজামিল যেরূপ দুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ স্মার্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহু-বার নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনাম-প্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার (ক্লেশই) লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনা করিলেও নামপরাধী

প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—“শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্ সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার নামী হইতেও অধিক কৃপাময়। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরাই এমন দুর্দ্দৈব অর্থাৎ শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণে আমার এইরূপ অপরাধ আছে যে, আমার নামেতে বিশ্বাস ও অনুরাগ হইতেছে না।”* সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তিতে যাহারা সন্দেহ করে, তাহারাই নাস্তিক। আর যাঁহারা নিজের অযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য অকপটে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ভক্তি-পথের পথিক। আমরা নাস্তিক না হইয়া শুদ্ধভক্তের অনুগামী হইব।



চিত্রকেতু

শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার এক কোটি মহিষী ছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই বন্ধ্যা হওয়ায় চিত্রকেতুর হৃদয়ে শান্তি ছিল না।

* নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
—শ্রীশিক্ষাষ্টক

কোন এক সময় মহর্ষি অঙ্গিরাঃ কৃপা-পূর্ব্বক চিত্রকেতুর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া একটি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। চিত্রকেতুর মহিষীগণের মধ্যে যিনি প্রথম বিবাহিতা, তাঁহার নাম—কৃতদ্যুতি। ঋষি অঙ্গিরাঃ সেই মহিষীকে যজ্ঞশেষ প্রদান করেন। তাহাতে কৃতদ্যুতির গর্ভে রাজার একটি সুন্দর কুমার জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে রাজার অন্যান্য মহিষীগণ সপত্নীর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহারা কুমারকে বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করেন। কৃতদ্যুতি ও চিত্রকেতু উভয়ে একমাত্র পুত্রের শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়েন। রাজমহিষী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলেন—"বিধাতা মাতাপিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রের মৃত্যুর বিধান করিলে তাঁহাকে কিরূপে মঙ্গলময় বলা যাইবে? তিনি নিজেই নিজের সৃষ্টির বিরুদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন! তিনি নিশ্চয়ই প্রাণিগণের শত্রু। যদি জন্ম-মরণ-সম্বন্ধে কোন নিয়ম না-ই থাকে, যদি নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারেই প্রাণিগণের জন্ম মরণ ঘটে, তবে আর ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিধাতা নিজের সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্য যে স্নেহ-পাশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পুত্রাদিকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া যদি সেই পাশ স্বয়ংই ছিন্ন করেন, তবে কি আর কেহ কোনদিন পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করিবে? ক্রমে সৃষ্টি লোপ পাইবে; ইহার দ্বারা বিধাতার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে।"

এইরূপ নানা কথা বলিয়া কৃতদ্যুতি বিধাতাকে নিন্দা ও পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া মৃত পুত্রকে আহ্বান করিতে

লাগিলেন। রাজা ও রাণীর শোকে সমস্ত রাজধানী অচেতনপ্রায় হইল। সমস্ত রাজ্য শোকাচ্ছন্ন ও নিরানন্দময় প্রতিভাত হইল। এইরূপ অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের সহিত অঙ্গিরাঃ ঋষি চিত্রকেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাজা মৃত-পুত্রের নিকট মৃতের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, প্রজাবৃন্দ, নগরবাসী সকলেই নানাপ্রকার মোহবৃদ্ধিকর আপাতপ্রিয় কথা বলিয়া রাজা ও রাণীর শোকাগ্নিতে আরও ইন্ধন প্রদান করিতেছে। কেহ বা স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রধানা মহিষীর সপত্নী-গণ হিংসানল পরিতৃপ্ত করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। অজ্ঞানতমঃ সকলের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ সময় শ্রীনারদ ও অঙ্গিরাঃ উভয়েই চিত্রকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"হে মহারাজ! তুমি যাহার জন্য এইরূপ শোক করিতেছ, সে তোমার কে? তুমি বা ইহার বন্ধুদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি? তুমি হয় ত' বলিবে, তুমিই ইহার পিতা ও সে তোমার পুত্র। বলি, তোমাদের এই সম্বন্ধ কি পূর্ব্বে ছিল? এখনও কি আছে? না ভবিষ্যতে থাকিবে? স্রোতের বেগে বালুকারাশি যেমন একবার বিযুক্ত হইয়া যায়, আবার আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণও কালের নিয়মানুসারে একবার আসিয়া মিলিত হয়, আবার চলিয়া যায়। ধান্য-বীজ বপন করিলে তাহাতে কখনও ধান উৎপন্ন হয়, কখনও বা উহার অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি

নষ্ট হইয়া যায়। ভগবানের বিমুখমোহিনী মায়ার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণিগণ কখনও পুত্রাদিরূপে পিত্রাদিতে জন্ম লাভ করে, কখনও করে না, কখনও বা তাহাদের জন্মই রহিত হইয়া যায়। এইরূপ নশ্বর সম্পর্কের জন্য কি শোক করা উচিত? তোমরা, আমরা ও চরাচর জগৎ এই যে এক বর্ত্তমান কালে রহিয়াছি, তাহা জন্মের পূর্ব্বে এক সঙ্গে ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। বীজ হইতে যেরূপ বীজের উৎপত্তি হয়, পিতার দেহ দ্বারা মাতৃদেহ হইতেও সেইরূপই পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ জড়দেহের জন্য তুমি শোক করিতেছ কেন? জড় কি কখনও চেতনের ন্যায় নিত্য হইতে পারে?"

এই মহাপুরুষদ্বয়ের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা চিত্রকেতু বলিলেন,—"আপনারা দুইজন কে? আপনারা অবধূত-বেশে আত্মগোপন করিয়া কোথা হইতে আসিয়াছেন? ভগবানের প্রিয় মহাভাগবতগণ উন্মত্তের মত বেশ গ্রহণ করিয়া বিষয়াসক্ত-চিত্ত আমাদের ন্যায় মূর্খ লোকের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাকেন। আমি গ্রাম্য পশুর মত মূঢ়বুদ্ধি, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। আপনারা আমার জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিউন।"

তখন মহর্ষি অঙ্গিরাঃ কহিলেন,—"হে রাজন্! তুমি পুত্র-কামনা করিলে তোমাকে যে ব্যক্তি প্রদান করিয়াছিল, আমি সেই অঙ্গিরাঃ; আর ইনি পরমপূজ্য নারদ ঋষি। তুমি ভগবদ্ভক্ত, শোক, মোহাদি তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না,—এইরূপ

বিচার করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেবারত তোমার কিছুতেই শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম তখনই তোমাকে পরমজ্ঞান প্রদান করিতাম; কিন্তু তোমার অন্য অভিলাষ আছে জানিয়া তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছি। এখন তুমি পুত্রবদ্গণের দুঃখ অনুভব করিতেছ। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিষয় সকলই অনিত্য। পৃথিবীর রাজ্য, সৈন্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃজ্জন, ইহারা সকলেই ভয়, মোহ, শোক ও পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় ইহারা ক্ষণে আসে ও ক্ষণে চলিয়া যায়। স্বপ্ন, মায়া ও সঙ্কল্পের ন্যায় ইহারা ক্ষণস্থায়ী। এই দেহই বিবিধ ক্লেশের আকর। অতএব তুমি শান্তচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। 'তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? পরিণামে কোথায় বা যাইবে? শোক-মোহাদির দ্বারা তুমি অভিভবনীয় কি না,' ইহা বিচার করিয়া এই জগতের নিত্যত্বে বিশ্বাস পরিত্যাগ কর ও পরা শান্তি লাভ কর

জগদ্গুরু শ্রীনারদ কৃপা-পূর্ব্বক চিত্রকেতুকে বলিলেন,—"তুমি সংযত হইয়া আমার প্রদত্ত এই পরম মঙ্গলপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ কর। তুমি সপ্তরাত্রির মধ্যেই মহাপ্রভু সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করিতে পারিবে। মহাদেবাদি দেবগণ এই সঙ্কর্ষণ-প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছেন।"

এদিকে নারদ মৃত রাজকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়া বলিলেন,—"তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ বলিয়া তোমার আয়ুষ্কাল এখনও

অবশিষ্ট আছে। অতএব তুমি পুনরায় নিজের শরীরে প্রবেশ কর ও অবশিষ্টকাল রাজ্য ভোগ কর।" তখন সেই কুমারের দেহগত জীব বলিল,—"আমি কর্ম্মবশে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি। ইহারা বা কোন্ জন্মে আমার মাতা-পিতা ছিল? এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ ও উপেক্ষক হইয়া থাকে। যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদি বস্তু ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে ভ্রমণ করে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে ভ্রমণ করিতেছে। যে-কাল-পর্য্যন্ত যে-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি মমতা থাকে; সম্বন্ধরহিত হইলে আর মমতা থাকে না। দেহই জন্মিয়া থাকে ও দেহেরই মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই; তাহা নিত্যবস্তু; তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আত্মা কখনও কর্ম্মফল-জনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করে না।"

ইহা বলিয়া জীবাত্মা চলিয়া গেলে চিত্রকেতু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং মোহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। যে-সকল মহিষী কুমারকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অতিশয় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা অঙ্গিরার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-কামনা পরিত্যাগ করিলেন। সুধী চিত্রকেতুও মহাপুরুষদ্বয়ের উপদেশে শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন; নারদ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শরণাগত ও জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুকে ভগবানের ভজন-শিক্ষা

দিলেন। সাতরাত্রির পরই চিত্রকেতু বিদ্যাধরগণের আধিপত্যরূপ অবান্তর ফল লাভ করিলেন। তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে সঙ্কর্ষণের দর্শন পাইলেন। চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণ-প্রভুকে স্তব করিয়া বলিলেন,—"হে অজিত! আপনি অন্য সকলের দ্বারা অজিত হইলেও শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা জিত; তাহার কারণ, আপনি ভক্তগণকে আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। এজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বকারণ-কারণ। যে-সকল বিষয়-পিপাসু নরপশু সর্ব্বোত্তম আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিভূতিস্বরূপ অন্যান্য দেবতাকে উপাসনা করে, তাহারা অতিশয় মূর্খ। সেবকের রাজদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ যেরূপ রাজকুল-নাশের পর বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যান্য দেবতার প্রদত্ত ভোগ্যসমূহও দেবতাগণের নাশের পর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবত-ধর্ম্মে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ নাই। তাহাই জীবের একমাত্র মঙ্গলপ্রদ-ধর্ম্ম। আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে অতিশয় পাপাচ্ছন্ন নীচ জাতি পর্য্যন্ত সংসার হইতে মুক্ত হয়।"

ভগবান্ সঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে বহু উপদেশ প্রদান করিবার পর বলিলেন, বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে চিত্রকেতু শীঘ্রই সঙ্কর্ষণদেবকে প্রাপ্ত হইবেন। তৎপরে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ-লক্ষ বর্ষ যাবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সুমেরুর গহ্বরে বিদ্যাধর স্ত্রীগণের দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। একদিন চিত্রকেতু ভগবান্ বিষ্ণুর প্রদত্ত একটি বিমানে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে

পাইলেন, মুনিগণের সভায় পরমহংস-শিরোমণি মহাদেব পার্ব্বতী-দেবীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া পার্ব্বতীদেবী শুনিতে পান, এইরূপভাবে উচ্চহাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"অহো! শুনিয়াছি, মহাদেব লোকগুরু ও ধর্ম্মের বক্তা। কি আশ্চর্য্য, ইনি মুনি-সভাতে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! সাধারণ গ্রাম্য নীচ ব্যক্তিগণও গোপনে পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই মহাদেব তপস্বী হইয়াও সভা-মধ্যে পত্নীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন!" মহাদেব চিত্রকেতুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও ঈষৎ হাস্য করিয়া নীরবেই রহিলেন; তাঁহার অনুচর সভ্যগণও নীরব থাকিলেন।

চিত্রকেতু কি জন্য ও কি ভাবে মহাদেবকে এইরূপ বলিয়া-ছিলেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার শক্তি নাই। মহাজনগণ বলেন, চিত্রকেতুর অভিপ্রায় এই ছিল যে, শিব ঈশ্বর—সমর্থ পুরুষ। বাহ্য-দৃষ্টিতে ইঁহার সুদুরাচার থাকিলেও তাহা ইঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না; কিন্তু মূর্খ ও কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ ইঁহার নিন্দা করিয়া অপরাধী হইবে; দক্ষের ন্যায় শিবনিন্দা-জনিত অপরাধে সাধারণের সর্ব্বনাশ হইবে,—এই বিচারে চিত্রকেতু ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। 'সর্ব্বলোকের মঙ্গলকামী চিত্রকেতু কঠোর-ভাষী হইলেও হরিভক্ত। অতএব তাঁহার প্রতি আমি ক্রোধ করিতে পারি না', মহাদেবেরও এই অভিপ্রায় ছিল। শিবের এই অভিপ্রায় জানিয়াই সভাসদ্‌বর্গ চিত্রকেতুর প্রতি কোন ক্রোধ

প্রকাশ করেন নাই। চিত্রকেতুর যদি শিব-নিন্দা করাই অভি-প্রায় হইত, তাহা হইলে সভাসদ্‌বর্গ কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন।

পার্ব্বতীদেবী লোকশিক্ষা-কল্পে একটি অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রভু সঙ্কর্ষণের প্রেরণায় চিত্রকেতুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"অহো! যাঁহার চরণকমল ব্রহ্মাদি দেবতা ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই জগৎ-পূজ্য শিবকে এই ব্যক্তি শাসন করিতেছে! অতএব এই ব্যক্তি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করুক, যেন পুনর্ব্বার সাধুদিগের প্রতি অপরাধ করিতে না পারে।"

চিত্রকেতু পার্ব্বতীদেবীর এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং অবনত-মস্তকে সতীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 'অভিশাপ শিরোধার্য্য করিতেছি' বলিয়া তাহা বরণ করিলেন।

চিত্রকেতু—ভগবদ্ভক্ত। তিনি কখনও কর্ম্মের অধীন নহেন। জাতপ্রেম ভক্তের কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে না। অভিশাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকাদিতে চিত্রকেতুর তুল্যদর্শন, বিদ্যাধরগণের আধিপত্য পরিহার ও বিরহ দ্বারা প্রেমক্ষুধা-বর্দ্ধনের জন্য এবং বৈকুণ্ঠে স্বীয় শ্রীচরণযুগলের সেবা-মাধুর্য্য-প্রদানার্থ ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব পার্ব্বতীদেবীর হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা এই অভিশাপ প্রদান করাইয়াছিলেন।

শাপ-শ্রবণে চিত্রকেতু বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না দেখিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন,—"যাঁহারা শ্রীহরির ভৃত্যের ভৃত্য,

বিষয়সুখে নিস্পৃহ, সেই চিত্রকেতু প্রভৃতি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহা দেখিলে ত'? নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও-ভয়-প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।"

চিত্রকেতু জগতে বৈষ্ণব-নিন্দার গুরুত্ব শিক্ষা-দান ও পার্ব্বতীর বাক্য সার্থক করিবার জন্য 'বৃত্রাসুর' নামে আবির্ভূত হইলেন। অসুরযোনিতে অবস্থান-কালেও তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বিচারসমূহ বিরাজিত ছিল। ইন্দ্র এই বৃত্রাসুরকে বধ করেন। বৃত্রাসুর দেহত্যাগ-কালে ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবের পার্ষদ-দেহ লাভ করিয়াছিলেন।



রাজা সুযজ্ঞ

উশীনরদেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ রাজার মৃতদেহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার অঙ্গশোভা দর্শন করিতে থাকে। তিনি শত্রুগণের প্রতি ক্রোধ-বশতঃ যেরূপ ক্রোধব্যঞ্জক ভাব মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও ঠিক সেই ভাবেই তাহার দেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার মহিষীগণ রাজাকে রণক্ষেত্রে

মৃত্যুগ্রস্ত দেখিয়া হস্ত-দ্বারা বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে রাজার নিকট পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা অশ্রু-ধারায় প্রিয়তম স্বামীর চরণ অভিষিক্ত করিতে করিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহিষীগণের কেশ-পাশ ও অলঙ্কার-সমূহ আলুলায়িত ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহারা আক্ষেপ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"অহো! নিষ্ঠুর বিধাতা আজ আমাদের কি দশা করিল? উশীনর দেশবাসী প্রজাগণ কিরূপ করিয়া এই শোক সহ্য করিবে? হে বীর! তোমাকে না দেখিয়া আমরা কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব? তুমি যে-স্থানে গিয়াছ, আমাদিগকেও সেই স্থানে লইয়া যাও। আমরা তথায় গিয়া তোমার পদ-সেবা করিব।"

যাহাতে অন্য লোক স্বামীর শব দাহ করিবার জন্য লইয়া যাইতে না পারে, এজন্য মৃত-পতিকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মহিষী-গণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। মৃত রাজার আত্মীয়গণের উচ্চ বিলাপধ্বনি যমরাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বালকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং রাজার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক-বেশী যম ঐরূপ শোকের দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক; ইহারা প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছে। ইহারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সহধর্ম্মী। ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তথাপি ইহাদিগের কি মোহ! যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মানুষের উৎপত্তি, তথায় এই

ব্যক্তি যাইতেছে। ইহার প্রতিকার অসম্ভব জানিয়াও ইহারা বৃথা শোক করিতেছে! আমাদের ন্যায় বালকের যেটুকু বুদ্ধি আছে, দেখিতেছি, ইহাদের তাহাও নাই। মাতা-পিতা আমাদিগকে এই সংসার-দুঃখসাগরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বল,—দুর্ব্বল হইলে যাঁহার কৃপায় আমরা রক্ষিত হইয়াছি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু যাঁহার কৃপায় আমাদিগকে গ্রাস করে নাই, আর যিনি আমাদিগকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। পথে পতিত কোন বস্তুকে যদি পরমেশ্বর রক্ষা করেন, তবে কেহ তাহা নষ্ট বা অপহরণ করিতে পারে না এবং যাঁহার বস্তু, সেই ব্যক্তি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহ-মধ্যে অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়, আর তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে বনের মধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয়। ভগবান্ উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না। গৃহ ও গৃহস্থ দুইটি ভিন্ন বস্তু; কিন্তু যাহারা অত্যন্ত মূর্খ, তাহারা গৃহকেই 'গৃহস্থ' মনে করে। সেইরূপ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি দেহকেই দেহী মনে করে। হে মূঢ় ব্যক্তি-গণ! তোমরা যাঁহার জন্য শোক করিতেছ, সেই সুযজ্ঞ রাজা তোমাদের সম্মুখেই শয়ন করিয়াছে; সে ত' অন্য কোথায়ও যায় নাই। অতএব তাহার জন্য শোক করিতেছ কেন? এতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি তোমাদের কথা শুনিয়াছে ও তাহার উত্তর দিয়াছে। এখন তাহাকে না পাইয়া কি শোক করিতেছ? যিনি শ্রবণ করেন ও উত্তর দেন, তাঁহাকে কস্মিন্‌কালেও কেহ

দেখিতে পায় না। যাহা দেখা যায়, সে দেহত' এখনও দেখিতে পাইতেছ।

এক ব্যাধ বনের যেখানে-সেখানে পক্ষী দেখিলেই জাল বিস্তার করিয়া ও মাংসাদির প্রলোভন দেখাইয়া পক্ষীদিগকে ধরিত। ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে কুলিঙ্গ নামক দুইটি পক্ষী দেখিতে পাইল। উহাদের মধ্যে একটি পুরুষ, আর একটি স্ত্রী। পক্ষিণী ঐ ব্যাধের দ্বারা লুব্ধ হইয়া জালে বদ্ধ হইল। পক্ষীটী পক্ষিণীকে ঐরূপ বিপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে উহার বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ ছিল না। দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—'বিধি কি নিষ্ঠুর! আমার স্ত্রী এইরূপ বিপন্ন হইয়া শোক করিতেছে। ইহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কি প্রয়োজন-সিদ্ধি হইবে? নির্দ্দয় বিধি যদি আমার অর্দ্ধদেহরূপ পত্নীকে গ্রহণ করে, তবে আমাকেও গ্রহণ করুক। পত্নীবিহীন দুঃখভারাক্রান্ত অবশিষ্ট দেহার্দ্ধ লইয়া জীবিত থাকিয়া আমার কি লাভ? মাতৃহীন শাবকগুলি আহারের জন্য তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে। উহাদের এখনও পক্ষোদ্গম হয় নাই। এই মাতৃহীন শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব?' পক্ষী প্রিয়ার বিরহে ব্যথিত হইয়া পত্নীর সমক্ষে এইরূপ বিলাপ করিতেছিল। এই সময় ব্যাধ গোপনে দূর হইতে পক্ষীটীকে বাণে বিদ্ধ করিল।

মূঢ় মহিষীগণ! তোমরাও ঐরূপ নির্ব্বোধ। তোমরাও কুলিঙ্গ পক্ষীর ন্যায় নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না। শত শত

বৎসর ধরিয়া এইরূপভাবে শোক করিলেও তোমাদের পতিকে ফিরিয়া পাইবে না।”

যম এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া সুযজ্ঞ রাজার মহিষী ও জ্ঞাতিগণের শোক দূর করিয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী নশ্বর দেহের জন্য শোক-মোহে অভিভূত না হইয়া নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

“দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায়, নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥”

প্রহ্লাদ মহারাজ

হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে দেবতাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই অসুর ত্রিলোক ও সমস্ত দিক্ জয় করিয়া সমস্ত প্রাণীকে নিজের বশে আনয়ন করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদে সে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া নানাভাবে বিহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনজন ব্যতীত সকল লোক-পালই উপহারের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র একটি যুদ্ধের বিরাট্ আয়োজন করিলেন। অসুর-দলপতিগণ ইহা জানিতে পারিয়া নানা দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবতাগণ হিরণ্যকশিপুর বাসস্থান নষ্ট করিয়া দিলেন ও দৈত্যরাজের মহিষী কয়াধূকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

ইন্দ্রের সহিত পথে নারদের দেখা হইল। নারদ ইন্দ্রকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, নিরপরাধা রমণীকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া তাঁহার কিছুতেই উচিত নহে। বিশেষতঃ কয়াধূ পরস্ত্রী ও সাধ্বী। ইন্দ্র বলিলেন যে, ঐ দানব-পত্নী কয়াধূর গর্ভে যে অসুর-কুমার রহিয়াছে, সেই কুমার ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কয়াধূকে নিজের গৃহে সযত্নে রক্ষা করিবেন। পুত্র জন্মিলে শিশুকে বধ করিয়া পরে মাতাকে ছাড়িয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন—"এই গর্ভস্থ শিশু হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অসুর-স্বভাব

নহেন। ইনি নিষ্পাপ, মহা-ভাগবত, মহা-প্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণু-পার্ষদ। কাহারও ইঁহাকে বধ করিবার সাধ্য নাই।" দেবর্ষি নারদের এই বাক্যে ইন্দ্র কয়াধূকে পরিত্যাগ করিলেন।

হিরণ্যকশিপু তখন মন্দরাচলে ঘোর তপস্যায় রত ছিল। তাই দেবর্ষি কয়াধূকে বলিলেন,—"চল মা, যতদিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, তুমি নিরাপদে আমার আশ্রমে বাস করিবে।"

কয়াধূ নারদের আশ্রমে রহিলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ গর্ভস্থ শিশুকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার মাতাকে ভগবত্তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদ গর্ভে থাকিয়াই শুকদেবের মত তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিল। সেই বরের প্রভাবে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোন স্থানে, দিবসে অথবা রাত্রিতে, ব্রহ্মার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য প্রাণী হইতে, কোন অস্ত্রে, পৃথিবীতে বা আকাশে, মনুষ্য বা পশু, চেতন বা অচেতন, দেবতা, অসুর প্রভৃতি কাহারও নিকট হইতে তাহার মৃত্যু ঘটিবে না, যুদ্ধে কেহই তাহার সহিত পারিবে না, সে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবে। বর-লাভান্তে হিরণ্যকশিপু শ্রীনারদ-ঋষির আশ্রম হইতে কয়াধূকে স্বীয় রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করিল। প্রহ্লাদ তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ শশি-কলার মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ অতি শৈশব-কাল হইতেই খেলা-ধূলা পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়-চিত্তে জড়বৎ অবস্থান করিতেন। তাঁহার চিত্তকে কৃষ্ণ-গ্রহ পাইয়া বসিয়াছিল। তাহাতে তিনি এই বহির্ম্মুখ জগতের কোন কথাই জানিতেন না। কি উপবেশন, কি ভ্রমণ, কি ভোজন, কি পান, কি শয়ন, কি কথোপকথন, কোন বিষয়েই ভোগের কোন সন্ধান করিতেন না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ-প্রকাশ, কখনও বা উচ্চৈঃ-স্বরে গান করিতেন; কখনও বা উৎকণ্ঠা-বশতঃ কৃষ্ণকে উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিতেন এবং অত্যধিক প্রেমানন্দ-বশতঃ লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় সর্ব্বদাই অভিনিবিষ্ট ও প্রেমানন্দে মগ্ন ছিলেন। অসৎসঙ্গে পতিত দীন ব্যক্তিগণও তাঁহার সঙ্গে ভগবানে নিষ্ঠা ও রতি লাভ করিতেন।

বালকের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল। দৈত্যগণের গুরু শুক্রাচার্য্য পৌরোহিত্য-কার্য্যে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুই পুত্রই প্রহ্লাদের শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকেও অন্যান্য অসুর-বালকগণের ন্যায় 'দণ্ডনীতি' প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু 'এই ব্যক্তি মিত্র, ঐ ব্যক্তি শত্রু'—এইরূপ ভেদজ্ঞানের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না।

একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তুমি কোন্ কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে কর, আমাকে বল।" প্রহ্লাদ বলিলেন,—"এই অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য।"

হিরণ্যকশিপু পুত্রের মুখে শত্রু-পক্ষ বিষ্ণুর প্রতি এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির কথা শুনিয়া ক্রোধে হাস্য করিতে করিতে বলিল,—"শিশুদিগের বুদ্ধি এইরূপ পরবুদ্ধি-প্রভাবেই নষ্ট হয়। এই বালককে পুনর্ব্বার গুরু-গৃহে লইয়া যাও, ইহাকে খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা কর, যেন ছদ্মবেশী বৈষ্ণবগণ ইহার আর কোনপ্রকার বুদ্ধি নষ্ট করিতে না পারে।"

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে নীত হইলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ! সত্য বল ত' দেখি,—এত বালকের মধ্যে তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হইল কেন? তুমি ইহা কোথা হইতে পাইলে?" প্রহ্লাদ বলিলেন,—"যে শ্রীহরির মায়া-দ্বারা চালিত হইয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ 'ইনি আত্মীয় ইনি পর'—এইরূপ অসত্য অভিনিবেশে মগ্ন হয়, সেই মায়াধীশ ভগবানই ইহার কারণ। সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে।" হিরণ্যকশিপুর বৃত্তিভোজী ষণ্ডামর্ক ইহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও অন্যান্য ছাত্রগণকে বেত্র আনয়ন করিতে বলিলেন; আরও বলিলেন,—"দৈত্যকুলের কুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি প্রহ্লাদকে দণ্ড-দান

ব্যতীত আর কিছুতেই ভাল করা যাইবে না। এই বালক দৈত্য-বংশরূপ চন্দন-বনে কণ্টক-বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই অসুররূপ চন্দন-বন-বিনাশের কুঠার-স্বরূপ যে বিষ্ণু, প্রহ্লাদ সেই (কুঠারেরই) সংশ্লিষ্ট দণ্ডস্বরূপ।"

ষণ্ডামর্ক এইরূপভাবে প্রহ্লাদকে নানাপ্রকার তিরস্কার ও তাঁহার প্রতি ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বহু ভয় দেখাইলেন ও পুনরায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কামমূলক শাস্ত্র-সমূহ প্রহ্লাদকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর ষণ্ডামর্ক যখন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রহ্লাদের রাজনীতিতে জ্ঞান হইয়াছে, তখন একদিন তাঁহাকে হিরণ্য-কশিপুর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রহ্লাদ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পিতাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে হিরণ্য-কশিপু প্রহ্লাদকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিল ও তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন-বদনে জিজ্ঞাসা করিল,—"বৎস ! তুমি তোমার গুরুদেবের নিকট এতদিন যাহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহা আমাকে বল।" প্রহ্লাদ কহিলেন,—"ভগবান্ বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবন, তাঁহার পূজা, তাঁহাতে দাস্যভাব, তাঁহার সহিত সখ্য ও তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি যিনি সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপু ষণ্ডকে ডাকিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শত্রু-পক্ষের আশ্রয় করিয়াছ ও এই বালককে আমার বিদ্বেষীর প্রতিই অনুরক্ত করিয়াছ। তুমি আমার মিত্রের বেশে পরম শত্রু।"

শুক্রাচার্য্যের পুত্র ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যাহা বলিল, তাহা সে আমার নিকট, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করে নাই। ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ।" হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রে কুল-নাশক! তুই এই বুদ্ধি কোথা হইতে পাইলি?"

প্রহ্লাদ কহিলেন,—"যে-সকল ব্যক্তি গৃহকেই তাহাদের জীবন-মরণের ব্রত করিয়াছে, তাহারা তাহাদের অসংযত ইন্দ্রিয়-সমূহ চালনা করিয়া ঘোর অন্ধকার-নরকে প্রবেশ করে। তাহারা রোমন্থনকারী পশুর ন্যায় সংসারাবদ্ধ পূর্ব্ব পুরুষগণের চর্ব্বিত সুখ-দুঃখ পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিয়া থাকে। তাহাদের বুদ্ধি কখনও গুরুর উপদেশে, কিংবা নিজের চেষ্টায়, অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না। যাহাদের চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, যাহাদের বাহ্য-বিষয়েই পরমার্থ-বুদ্ধি হইয়াছে, তাহারা কখনও পরম পুরুষার্থের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবার

কথা‚ জানিতে পারে না। তাহারা অন্ধচালিত অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া বিষয়-গর্ত্তে পতিত হয়। তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-প্রতিপাদক বেদরূপ দীর্ঘ-রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। যাঁহাদের জগতের কোন বিষয়ের প্রতি আসক্তি নাই, যাঁহারা একমাত্র বিষ্ণু-সেবাব্রত, সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদ-ধূলিতে যে-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অভিষিক্ত না হয়, সে-কাল-পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদের মতি শ্রীপুরুষোত্তম বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। মহতের পদরজই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল।”

এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে যে কিরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিল,—“এই বালককে অবিলম্বে এই স্থান হইতে লইয়া যাও। আমি ইহার মুখ দর্শন করিতে চাহি না। ইহাকে বধ কর। এই অধমই আমার ভ্রাতৃঘাতী; যেহেতু নিজের পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃব্য-ঘাতী বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে! পাঁচ বৎসর বয়সেই সে মাতা-পিতার প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছে! ইহাকে যে কোনভাবে বধ করিতে হইবে।”

হিরণ্যকশিপুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভীষণাকার রাক্ষসগণ শূল-হস্তে ভৈরব-নাদে ‘মার মার’ শব্দে প্রহ্লাদকে আঘাত করিতে লাগিল। দিগ্‌হস্তী, মহা-সর্প, অভিচার, পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ,

নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল, প্রস্তরাদিতে প্রক্ষেপ প্রভৃতি কোন উপায়ের দ্বারাই হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রাণবধ করিতে পারিল না।

যখন প্রহ্লাদকে শত-যোজন উচ্চ প্রাসাদ বা পর্ব্বত হইতে নীচে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন বালক প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া জগদ্ধাত্রী পৃথিবী সেই বিষ্ণুভক্তের সেবা করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অক্ষত দেখিয়া মায়াবি-শ্রেষ্ঠ শম্বর-দৈত্যকে মায়া সৃষ্টি করিয়া বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু শম্বরের প্রতিও বিমৎসর প্রহ্লাদ একমাত্র শ্রীমধুসূদনকেই স্মরণ করিতেছিলেন; তখন শ্রীভগবানের আদেশে সুদর্শনচক্র বালকের দেহ-রক্ষক হইয়া শম্বরের সহস্র-সহস্র মায়াকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে বায়ু দেহ শোষণ করিবার জন্য প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়স্থিত জনার্দ্দন সেই অতি ভীষণ বায়ুকে অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যখন অগ্নি প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে পারিল না, শস্ত্র-সমূহ তাঁহাকে ছিন্ন করিতে পারিল না, সর্প-দংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা মায়া, দিগ্‌গজ সমূহ ও উচ্চ স্থান হইতে পাতন, কোনটিই প্রহ্লাদের কেশ স্পর্শও করিতে পারিল না, তখন হিরণ্যকশিপু শঙ্কাযুক্ত হইয়া পড়িল ও 'কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়' হইল। তখন ষণ্ডামর্ক হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে সাহস-প্রদানার্থ বলিলেন,—"আপনার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে সমস্ত লোকপাল ভীত হয়। আপনি

একাকী ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ; আপনার কোনই চিন্তার কারণ দেখিতেছি না। যে-পর্য্যন্ত গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত যাহাতে এই শিশু পলাইতে না পারে, তজ্জন্য ইহাকে বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। হয় ত' বয়স-বৃদ্ধির সহিত ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের সেবার দ্বারা ইহার বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইতে পারে।"

ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর আদেশানুসারে প্রহ্লাদকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও দান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এই সকল শিক্ষা প্রহ্লাদের একটুও ভাল বোধ হইল না। যে-সকল উপদেশকের চিত্ত সংসারে আসক্ত, বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাদের উপদেশ প্রহ্লাদ 'উত্তম' বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না।

গৃহকর্ম্মানুরোধে ষণ্ডামর্ক অধ্যাপনার স্থান হইতে গৃহে চলিয়া গেলেন। সমবয়স্ক বালকগণ খেলা করিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রহ্লাদকে ডাকিল। প্রহ্লাদ সেই সকল বালকের নিকট হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ভাইসকল! এই দুর্ল্লভ ও পরমার্থপ্রদ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া শিশুকাল হইতেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, এই মনুষ্য-জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইলেও —অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী হইলেও এই জন্মে ক্ষণকালও শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য-জন্মে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদ-সেবনই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও বন্ধু। ইন্দ্রিয়ের সুখ যে-কোন জন্মে লাভ হয়।

তাহা দৈবযোগে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় পাওয়া যায়। সুতরাং সুখের জন্য প্রয়াস করা উচিত নহে। কারণ, সেইরূপ প্রয়াসে আয়ুরই ক্ষয় হয়। শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়, বিষয়-সুখের জন্য যত্ন করিলে কখনই সেইরূপ মঙ্গল-লাভ হয় না। সেজন্য বিবেকী পুরুষ যে-পর্য্যন্ত এই শরীরটি অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতেই সেই পর্য্যন্ত মঙ্গল-লাভের জন্য যত্ন করিবেন। সাধারণতঃ পুরুষের পরমায়ু একশত বৎসর পরিমিত কাল; তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুস্কাল উহার অর্দ্ধেক-মাত্র। তাহাও বৃথা অতিবাহিত হয়। কেন না, সে রাত্রিকালে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে। বাল্যকালেও মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, কৌমার অবস্থায় ক্রীড়ায় রত থাকিয়া দশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়, আবার নানা-প্রকার রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া তাহার আরও বিশ বৎসর চলিয়া যায়। দুঃখজনক কাম ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া তাহার অবশিষ্ট দশ বৎসর পরমায়ুঃ অতীত হইয়া যায়। কারণ, গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজেকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে? কেই বা প্রাণ হইতে প্রিয় অর্থের তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে? সংসারাসক্ত জীব নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রচুর যত্ন করে। তাহার চিত্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এতটা অনুরক্ত হইয়া যায় যে, সে কিছুতেই উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্নেহশীলা প্রিয়ার সহিত নির্জ্জন সঙ্গ স্মরণ করিয়া কে তাহা

পরিত্যাগ করিতে পারে? শিশুগণের অস্ফুট কলভাষণ স্মরণ করিয়া কে তাহাদের নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে? পুত্র, শ্বশুর-গৃহস্থিতা কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সামর্থ্য-রহিত বৃদ্ধ মাতা-পিতা, বহু মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ ও বিচিত্র ভোগোপকরণ-যুক্ত গৃহ, কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি, পশু ও ভৃত্যবর্গকে স্মরণ করিয়া কিরূপেই বা আসক্ত ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কোষকার কীট যেরূপ নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজেরই বহির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ জীবও ফল-লোভ-বশত কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার জীব কিরূপেই বা দেহ-গেহের প্রতি বিরক্ত হইবে? সেই ব্যক্তি কুটুম্ব-ভরণ-পোষণে নিজের যে বহুমূল্য আয়ুষ্কালের ক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না; আর ভগবদারাধনারূপ পরম-পুরুষার্থ যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারে না; কিন্তু তুচ্ছ একটি কপর্দ্দক-মাত্রের ব্যাঘাতকে অতিশয় তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে। সেই ব্যক্তি ত্রিতাপে তপ্ত ও ক্লিষ্ট হইয়াও নির্বেদ লাভ করিতে পারে না। পরবিত্ত-হরণকারীর মরণের পর যে যম-যাতনা, ইহলোকেও রাজ-দণ্ডাদিরূপ যে শাস্তি আছে, তাহা জানিয়াও কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ-কারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নানাভাবে পরবিত্ত হরণ করে। সাধারণ ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, **পণ্ডিত ব্যক্তিও কুটুম্ব পালন করিতে করিতে বিমূঢ় হইয়া যায়।** কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদি তাহাদের বন্ধনের শৃঙ্খলতুল্য হয়। অতএব তোমরা বিষয়াসক্ত দৈত্যগণের অসৎ-

সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও। তাঁহার আরাধনায় বয়সের অপেক্ষা নাই। তাঁহাকে প্রসন্ন করা বহু আয়াসের কার্য্যও নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মবিদ্যা, কর্ম্ম-বিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি, কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা সমস্তই ত্রিগুণাত্মক বেদের প্রতিপাদ্য। ঐ সকলই নশ্বর। পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্ম-নিবেদন—শরণাগতি, উহাই একমাত্র সত্য। ইহা আমার কল্পিত উক্তি নহে। স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ এই সুদুর্ল্লভ অমলজ্ঞান পূর্ব্বকালে শ্রীনারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রীনারদের শ্রীমুখে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। এই জ্ঞান যে কেবল পণ্ডিত বা উত্তম ব্যক্তিগণেরই উদয় হইবে, তাহা নহে, যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর ঐকান্তিক ভক্ত, যাঁহাদের চিত্ত ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুতেই অভিনিবিষ্ট নহে, সেই সকল মহাপুরুষের কৃপায় সকলেরই এই জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।”

দৈত্য-বালকগণ প্রহ্লাদের সুমধুর ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া উহাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট-বিচারে গ্রহণ করিলেন, ষণ্ডা-মর্কের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। এবার ষণ্ডামর্ক দেখিলেন, কেবল যে প্রহ্লাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা নহে ; তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে সুকোমলমতি বালকগণের বুদ্ধিও বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সকল কথা হিরণ্যকশিপুকে জানাইলেন। পূর্ব্বেই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার নানা আয়োজন করিয়াছিল, এবার অন্য দৈত্য-বালকগণকেও প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিতেছে শুনিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া পুত্রকে অচিরে

হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প করিল এবং সুতীব্র বাক্যে বালককে শাসন করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ পিতাকে অনেক বুঝাইলেন। আসুরিক স্বভাব ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বলে সকলেই বলী, বিষ্ণুই মূল পুরুষ,—পিতাকে ইহা বুঝাইবার জন্য প্রহ্লাদ বহু চেষ্টা করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বান্তর্য্যামী—তিনিই মূল পুরুষ। তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল,—"ওরে হতভাগ্য বালক! তুই বলিতেছিস্, আমি ব্যতীত আর একজন জগতের ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সকল স্থানেই অবস্থান করেন। তুই নিশ্চয় মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মান্ধ। যদি তোর ঈশ্বর সর্ব্বত্রই থাকিবেন, তবে আমার এই রাজসভার স্তম্ভে তা'কে দেখা যায় না কেন? আমি এখনই আত্মশ্লাঘাকারী তোর মস্তক ছেদন করিব। দেখি, তোর হরি আসিয়া তোকে রক্ষা করুক।" হিরণ্যকশিপু এইরূপ ক্রোধবশে দুর্ব্বাক্যের দ্বারা মহাভাগবত প্রহ্লাদকে বারংবার তর্জ্জন করিয়া প্রহ্লাদের মস্তক ছেদন করিবার জন্য খড়্গ গ্রহণ করিল এবং সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভ-গাত্রে মুষ্টি প্রহার করিল। সেই মুষ্টি-প্রহারে স্তম্ভ হইতে অতি ভীষণ শব্দ নির্গত হইল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্ব-স্ব ধামে থাকিয়া এই ভীষণ শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহাদেরও স্থান বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল। ভগবান্ বিষ্ণু নিজ-ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য ও সর্ব্বত্র স্বীয় ব্যাপ্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার ইচ্ছায় অতি অদ্ভুত অমানুষ ও অশেষ-দৈত্যঘাতক

অতি-ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া সভা-মধ্যেই ঐ স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্যকশিপু তখন মনে মনে ভাবিতেছিল,—'এই প্রাণীটী পশুও নহে, মনুষ্যও নহে। এই অদ্ভুত প্রাণীটী কি নৃসিংহ ?' হিরণ্যকশিপু এইরূপ মীমাংসায় নিযুক্ত ছিল; এমন সময় ভগবান্ শ্রীনৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু গদা ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল। অগ্নিকুণ্ডে পতিত পতঙ্গের ন্যায় নৃসিংহ-তেজের মধ্যে হিরণ্যকশিপু অদৃষ্ট হইল। তথাপি হিরণ্যকশিপু ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু বহু বাহুযুক্ত ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব নখাস্ত্রের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় উৎপাটন করিলেন ও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে আগত শস্ত্রধারী সহস্র সহস্র দৈত্যকে সেই নখাস্ত্রের দ্বারাই নিহত করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব সভা-মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজ-আসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু ভয়ে কেহই তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন না। এদিকে দেবপত্নীগণ তখন নৃসিংহদেবের উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের বিমান-সমূহে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাগণ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাও ক্রোধাবিষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গমন করিতে পারিলেন না; অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও দেবতাগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভগবানের ঐরূপ অদ্ভুত রূপ

দর্শন করিয়া ভীত হইলেন, ভগবানের সমীপে যাইতে সাহসিনী হইলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য উপায় স্থির করিলেন। প্রহ্লাদকে স্বীয় পাদমূলে পতিত দেখিয়া করুণার্দ্র ভগবান্ প্রহ্লাদের মস্তকে নিজ করকমল অর্পণ করিলেন। প্রহ্লাদ প্রেম-গদ্‌গদ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-পটুতা, তেজঃ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সকল গুণ সেই পরম পুরুষের আরাধনায় সমর্থ নহে। ভগবান্ শুধু ভক্তির দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণ-ভূষিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেইরূপ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। সেই চণ্ডাল নিজের সহিত কুলকে পবিত্র করিতে পারে; কিন্তু গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না। হে নৃসিংহদেব! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক ক্রোধের উপসংহার করুন। আপনি অসুরকে নিহত করিয়াছেন। মনুষ্যগণ ভয়-নিবৃত্তির জন্য আপনার এই নৃসিংহ-রূপ স্মরণ করিবে। আমি আপনার এই রূপে ভীত হইতেছি না; কিন্তু অসুরগণের দুঃসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সংসার-চক্র হইতে ভীত হইতেছি। আপনি কবে প্রসন্ন হইয়া আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করিবেন? আমি দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; আপনার দাস্যলাভের উপায় কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। হে নৃসিংহ! আপনার শ্রীচরণই যাঁহাদের একমাত্র

আশ্রয়স্থল, সেই সকল ভক্তের সঙ্গক্রমে আপনার স্বীকৃত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত লীলা-কথা বর্ণন করিতে করিতে আমি অনায়াসেই এই সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইব। হে নৃসিংহদেব! এই সংসারে মাতা-পিতা বালকের রক্ষক নহেন। কেন না, মাতা-পিতার দ্বারা পালিত হইয়াও বালক রক্ষা পায় না। ঔষধ রোগীর রক্ষা-কর্ত্তা নহে। কেন না, ঔষধ-প্রয়োগ-সত্ত্বেও কখনও কখনও রোগ-বৃদ্ধি ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে নৌকাও রক্ষক নহে। কারণ, নৌকায় আরূঢ় থাকা সত্ত্বেও লোক সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। আপনি যাঁহাকে উপেক্ষা করেন, কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই। আপনি যাঁহাকে কৃপা করেন, কেবল তাঁহারই রক্ষা হয়। মরীচিকা-সদৃশ বিষয়-সকলই বা কোথায়? আর সমস্ত রোগের উদ্ভবক্ষেত্র এই শরীরই বা কোথায়? ইহা জানিয়াও লোক-সকল নির্ব্বেদ লাভ করিতেছে না। যিনি সেবা করেন, তাঁহার প্রতি কল্পতরুর ন্যায় আপনার অজস্র কৃপা হয়। আমি কাম্যবস্তুর আশায় ইন্দ্রিয়রূপ সর্পবহুল সংসার-কূপে পতিত হইয়াছিলাম। ভগবান্ নারদ আমাকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন। হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার এই পাপ-দুষ্ট, বহির্ম্মুখ, অবিনীত, কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও ধনাদি ভাবনার দ্বারা নিপীড়িত মন আপনার কথায় প্রীতিযুক্ত হয় না। সেইরূপ মনে আমি কি প্রকারে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব? হে অচ্যুত! যেরূপ বহু সপত্নী এক স্বামীকে নিজ-নিজ দিকে আকর্ষণ করিয়া অস্থির করিয়া তোলে, সেইরূপ আমাকেও অপরি-

তৃপ্ত জিহ্বা এক দিকে, উপস্থ অন্য দিকে, চর্ম্ম ভিন্ন দিকে, উদর অপর দিকে, কর্ণ পৃথক্ দিকে, নাসিকা ইতর দিকে, চঞ্চল দৃষ্টি আর এক দিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্য দিকে আকর্ষণ করিয়া চঞ্চল ও বিনাশ করিতেছে। হে দেব! নিজ-মুক্তিকামী মুনিগণ প্রায়ই নির্জ্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন। তাঁহারা পরার্থপর নহেন। কিন্তু আমি কৃপণ বন্ধু-বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। সংসারে ভ্রমণশীল জীবের আপনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রক্ষক দেখি না। হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নের দ্বারা আপাত-সুখ-প্রতিম কার্য্য অনুভব হইলেও পর-বর্ত্তিকালে জ্বালাই উৎপন্ন হয়। গৃহমেধিগণের স্ত্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখ ঐরূপ কণ্ডূয়নের ন্যায়; তাহা দুঃখের পর দুঃখই প্রসব করে। তাহাতে কামুকগণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেবল ধীর ব্যক্তিই সেই কামের হস্ত হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারেন। মৌনব্রত, শাস্ত্র-জ্ঞান, তপস্যা, বেদ-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, নির্জ্জনে বাস, জপ ও সমাধি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে মঙ্গলের সাধক না হইয়া জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় হইয়া থাকে। হে পূজ্যতম! আপনার প্রতি নমস্কার, আপনার স্তব, আপনাতে কর্ম্মার্পণ, পূজন, আপনার চরণযুগল-স্মরণ ও লীলা-শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য ভক্তি লাভ করিতে পারে?"

প্রহ্লাদের স্তবে নৃসিংহদেব শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং প্রহ্লাদকে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শুদ্ধ-ভক্তের আদর্শ প্রহ্লাদ জানিতেন। ভগবান্ অনেক সময় জীবকে

নানাপ্রকার বর, এমন কি মুক্তি প্রভৃতি দান করিয়া বঞ্চনা করেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি শুদ্ধা ও অহৈতুকী ভক্তিকে তিনি অতি গোপনে সংরক্ষণ করেন। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের কথিত বর ভক্তি-যোগের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—"হে ভগবন্! স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐ সকল বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি কাম-সঙ্গ-ভীত ও নির্ব্বেদ-গ্রস্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। কাম সংসারের বীজ-স্বরূপ। হে অখিল-গুরো! আপনি করুণাময়। আপনি অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করা ব্যতীত জীবকে কোন অনর্থে নিমগ্ন করিতে পারেন না। আপনার নিকট হইতে যে-ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে কখনও আপনার ভৃত্য নহে, সে বণিক্। প্রভুর নিকট নিজের কোনরূপ সুবিধা-কামনাকারী ব্যক্তি ভৃত্য নহে। আর ভৃত্যের নিকট প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তিও প্রভু নহেন। আমি আপনার অহৈতুক সেবকানুসেবক। আপনি আমার নিরুপাধিক প্রভু। যদি আপনি আমাকে অভীষ্ট বর দান করিতে ইচ্ছাই করেন, তবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা—যেন আমার হৃদয়ে কোনপ্রকার কামনা-বাসনার উৎপত্তি না হয়।"

শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের এই বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। সিংহ অপর সকলের নিকট উগ্র-বিক্রম; কিন্তু নিজ-শাবকগণের নিকট অতিশয় স্নেহশীল। শ্রীনৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্ব-ভক্তের প্রতি অতিশয় স্নেহপূর্ণ।

প্রহ্লাদের চরিত্রে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রহ্লাদ শুদ্ধভক্তের আদর্শ। তিনি অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের নিকট অন্য কোন বস্তু কামনা করেন নাই। শান্তির কামনা, মুক্তির কামনা প্রভৃতিও শুদ্ধ ভক্তের নাই, ঐসকল বণিকের বৃত্তি,—ইহাই প্রহ্লাদ মহারাজ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

হে অচ্যুত! হে নাথ! আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে-যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই সর্ব্বক্ষণ আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক। বিবেকরহিত ব্যক্তি-গণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, আপনাকে নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতেও যেন সেইরূপ প্রীতি কখনও অপগত না হয়।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই—'আত্ম-নিবেদন' বা শরণাগতি। হিরণ্যকশিপু দৈত্যকুলের রাজা। তাহার জনবল, ধনবল কিছুরই অভাব নাই; এমন কি, সে অত্যাশ্চার্য্য তপোবলও লাভ করিয়াছিল। তাহাকে, দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, বা ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী কোনদিন কেহই বধ করিতে পারিবে

না,—সে এইরূপ বরও লাভ করিয়াছিল ; ত্রিলোক তাহার অধীন হইয়াছিল ; তাহার কোন শক্তি বা ঐশ্বর্য্যেরই অভাব ছিল না। কিন্তু প্রহ্লাদ অল্পবয়স্ক বালক ; শরণাগতি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। হিরণ্যকশিপুর দাম্ভিকতা বা ঐশ্বর্য্য-বল তাহাকে (নিজকে) রক্ষা করিতে পারিল না ; প্রহ্লাদের শরণাগতিই জয়ী হইল। শরণাগতকে ভগবান্ রক্ষা করেন। তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। প্রহ্লাদের চরিত্র ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—

"মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥"

পরম-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি 'যথার্থ সত্য' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আর সকলই নশ্বর ও মিথ্যা।



মহারাজ বলি

প্রজাপতি কশ্যপের গৃহে ও শ্রীঅদিতি দেবীর ক্রোড়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবসন, পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি শ্রবণা-দ্বাদশীতে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বাদশী 'বিজয়া' নামে বিখ্যাত। শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াই শ্রীঅদিতি ও শ্রীকশ্যপের নিকটে বামনরূপে প্রকাশিত হইলেন। মহর্ষিগণ বামন ব্রাহ্মণকুমারের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বামনদেবের উপনয়ন-কালে সূর্য্য-দেব সাবিত্রী উপদেশ করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত ও কশ্যপ কটি-সূত্র দান করিয়াছিলেন। পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, অদিতি দেবী কৌপীন বসন ও স্বর্ণচ্ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, সরস্বতী অক্ষমালা, কুবের ভিক্ষা-পাত্র এবং জগন্মাতা সতী ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পৌত্র মহারাজ বলি নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাহাতে ভৃগু-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞস্থানে শ্রীবামনদেব আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ শ্রীবামনদেবকে অভ্যর্থনা ও মহারাজ বলি আসন প্রদান করিয়া ভগবানের চরণযুগল ধৌত করিয়া দিলেন ও বিবিধ উপ-চারে তাঁহার পূজা করিলেন। চন্দ্রমৌলি-মহাদেব পরমভক্তি-

সহকারে যে বিষ্ণুর চরণ-জল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন 'বলি' তাহা অনায়াসে মস্তকে ধারণের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। 'বলি' শ্রীবামনদেবের স্তব করিয়া বলিলেন,—"আপনি যখন কৃপা-পূর্ব্বক আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত, বংশ পবিত্র ও যজ্ঞ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপনার হস্তে ভিক্ষার পাত্র দেখিতেছি। আপনাকে যাচক বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।"

বলির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবামনদেব বলিলেন,—"তোমার ঐহিক-ব্যাপারে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ও পারলৌকিক-ধর্ম্মে পিতামহ প্রহ্লাদ উপদেশকর্ত্তৃরূপে বর্ত্তমান। তোমার বংশে এ-পর্য্যন্ত এই-রূপ কোন কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি যাচক ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়া দান করেন নাই। তোমার পিতা বিরোচন দেবতাগণকে নিজের শত্রু বলিয়া জানিতে পারিয়াও তাঁহাদের প্রার্থনায় নিজ আয়ুঃ দান করিয়াছিলেন। তুমি এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার নিকট আমি কেবল আমার নিজ-পদ-পরিমিত ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিতেছি। তুমি উদার-চিত্ত ও বহু দানে সমর্থ হইলেও আমি তোমার নিকট অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কেন না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান গ্রহণ করা বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত।"

শ্রীবামনদেব তাঁহার ক্ষুদ্র পদত্রয়-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিতেছেন দেখিয়া বলিরাজ ব্রাহ্মণ-কুমারকে আরও অধিক পরিমাণ ভূমি ও দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবামনদেব বলিকে কহিলেন,—"ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল প্রিয় বিষয়-সমূহ রহিয়াছে,সেই সকল দ্রব্য কোনদিনই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। যদি ত্রিপাদ-ভূমি-লাভে আমার সন্তোষ না হয়, তাহা হইলে নয়টী বর্ষের সহিত একটী দ্বীপ লাভ করিয়াও পুনরায় সাতটী দ্বীপ লাভ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। পৃথু, গয় প্রভৃতি সম্রাট্‌গণ সপ্ত-দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াও অর্থ, দ্রব্য ও কামের তৃষ্ণার অবধি প্রাপ্ত হন নাই। প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে যে-সকল বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; তবেই হৃদয়ে শান্তি থাকে। অজিতেন্দ্রিয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ত্রিলোক লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারে না। অর্থ ও কামের জন্য অসন্তোষই জীবের পক্ষে সংসার।

বলিরাজ বামনদেবকে—'আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করুন', ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন। দানের সঙ্কল্পের জন্য বলি-মহারাজ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বিচক্ষণ শুক্রাচার্য্য বামনদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিষ্য বলিকে বলিলেন,—"তুমি ইঁহার কপট অভিসন্ধি জানিতে না পারিয়া ইঁহাকে ভূমি-দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, আমি ইহা ভাল মনে করিতেছি না। এই কপট ব্রহ্মচারী তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, সম্মান ও জ্ঞান—সমস্ত হরণ করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। ইনি তোমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া লইবেন। তুমি নিতান্ত মূঢ়। যদি সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে

দান করিয়া দাও, তাহা হইলে কিরূপে তোমার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? যে দানে নিজের জীবিকা-পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়, শাস্ত্র সেইরূপ দানের প্রশংসা করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্ম, সম্মান, অর্থ, কাম ও কুটুম্ব পালনের জন্য বিত্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তুমি যদি সর্ব্বস্ব একমাত্র বিষ্ণুকেই প্রদান কর, তাহা হইলে অন্যান্য কার্য্য আর কি দিয়া করিবে? কুটুম্বগণ অনাহারে থাকিয়া ক্লেশ পাইতেছে, কিম্বা হস্তে ভিক্ষা-পাত্র গ্রহণ করিয়াছে,—ইহা কি কোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি দেখিতে পারে? তুমি বিষ্ণুকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, কিন্তু 'ওম্' এইরূপ অঙ্গীকারের সহিত যাহা বলা হয়, উহাই সত্য এবং 'না' এইরূপ শব্দের সহিত যাহা বলা হয়, তাহাই মিথ্যা। বিশেষতঃ জগতে সত্যও ঈষৎ মিথ্যা ব্যতীত থাকিতে পারে না। মিথ্যাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা যায় না। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে উহা যেরূপ শীঘ্রই শুষ্ক ও ভূপতিত হয়, মিথ্যার নাশ হইলে এই দেহও সেইরূপ সদ্যই শুষ্ক হইয়া যায়। নীতি-শাস্ত্র বলেন,—স্ত্রীলোকের বশীকরণে, পরিহাসে, বিবাহে, জীবিকার জন্য, প্রাণসঙ্কটে, গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, কিম্বা কাহারও প্রতি হিংসা উপস্থিত হইলে মিথ্যা-বাক্য নিন্দনীয় নহে।"

দৈত্যবংশের কুলগুরু মহা-নীতিবিৎ শুক্রাচার্য্য বলিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীবিষ্ণুসেবা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন। কুলগুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া বলি ক্ষণকাল

মৌনভাবে বিচার করিয়া গুরুকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি যাহা গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি ; কিন্তু আমি মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র হইয়া একবার দানের অঙ্গীকার-পূর্ব্বক বঞ্চকের ন্যায় বৃত্তির লোভে কিরূপে তাহা অস্বীকার করিব ? দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রাণ-পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া পরের উপকার সাধন করিয়াছেন। **ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের কামনা-পূরণে যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও আত্মার মঙ্গলকারক।** অতএব আমি নিশ্চয়ই এই বামনদেবের কামনা পূরণ করিব।"

অসুরকুলগুরু শুক্রাচার্য্য ভগবানের প্রেরণা-বশতঃই শিষ্য বলিকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত ও কুলগুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। শীঘ্রই তোমার শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" কুলগুরু এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেও বলিরাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বামনদেবকে পূজা করিয়া প্রতিশ্রুত ভূমি দান করিলেন। বলি-রাজের উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময় অনন্তদেব শ্রীহরির বামন-রূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী, শরীর দ্বারা আকাশ, বাহুদ্বারা দিক্‌সমূহ ও দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আচ্ছাদন করিলেন। দ্বিতীয় চরণ ক্রমে-ক্রমে সত্যলোক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। তখন বামনদেবের তৃতীয় পদ-বিন্যাসের জন্য বলিরাজার দেয় আর অণুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে বলির সমস্ত ভূমি-সম্পত্তি একটী কপট ব্যক্তি দ্বারা অপহৃত হইতে দেখিয়া অসুরগণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, ঐ বামনরূপী বিষ্ণুকে হত্যা করাই তাহাদের ধর্ম্ম ও উপযুক্ত স্বামি-সেবা। অসুরগণ বলির অনিচ্ছাক্রমে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বামন-বধের জন্য ধাবিত হইল। বিষ্ণুর অনুচরগণ নিষেধ করা সত্ত্বেও অসুরগণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। বিষ্ণু-পার্ষদগণ অসুরসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। বিষ্ণু-পার্ষদ গরুড় প্রভুর অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া বরুণের পাশের দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে মহা বলবান্ বলি ঐশ্বর্য্যহীনের মত প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শ্রীহরির সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শুদ্ধভক্ত যদি আপাত বিপদ্ বা বন্ধনের মধ্যেও পতিত হন, তাহা হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় না ; হরিসেবায় তাঁহার অনুরাগ বিন্দুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। তিনি ভগবানের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধিকতর অনুরাগের সহিত সেবা করিয়া থাকেন।

বরুণ-পাশে আবদ্ধ বলির নিকট ভগবান্ বামনদেব বলিলেন, —"তুমি আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি প্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে। আমার দুই পদেই যাবতীয় ভূমি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন তুমি আমাকে তৃতীয় পদ-বিন্যাসের উপযুক্ত স্থান প্রদান কর। প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করায় তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্র-সম্মত। তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যও ইহা তোমাকে বলিয়াছিলেন। তুমি পাতাল প্রবেশ কর। তুমি

নিজকে অতিশয় ধনবান্ অভিমান করিয়া, প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। এই মিথ্যা-বাক্য বলিবার ফল তোমাকে কএক বৎসর ভোগ করিতে হইবে।"

লোকদৃষ্টিতে শ্রীবামনদেব বলির প্রতি বড়ই নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। তথাপি বলি অবিচলিত-চিত্তে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্যই কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহারাজ বলি বামনদেবকে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ-বিন্যাস করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধুবর্গ যে দণ্ডের বিধান করেন না, পূজ্যতম আপনার বিহিত সেই দণ্ড জীবগণের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলিয়াই আমি মনে করি। আপনি এক কার্য্যের দ্বারা বহু কার্য্য সম্পাদন করেন। আপনার ভক্তগণের মধ্যে পূজনীয় পিতামহ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু দ্বারা নানাভাবে হিংসিত হইয়াও আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। যে শরীর আয়ুষ্কালের অবসানেই জীবকে পরিত্যাগ করে, মর্ত্ত্যজনের এতাদৃশ শরীরের কি প্রয়োজন? স্নেবা-সম্পত্তি-হরণকারী স্বজননামধারী দস্যুগণের সেবা এবং সংসারের কারণ-স্বরূপ স্ত্রীর সঙ্গেই বা কি ফল? **যে-গৃহে কেবল আয়ুঃ ক্ষয় হয়, সেই-প্রকার গৃহেই বা প্রয়োজন কি?** জীব যে সম্পদের জন্য জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া এই অস্থির জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই সম্পদ্ হইতে দৈবকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক চ্যুত হইয়া আমি এখন আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে উপনীত হইয়াছি।"

যখন মহারাজ বলি শ্রীবামনদেবের নিকট এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন ভগবানের পরম প্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। বরুণ-পাশে আবদ্ধ থাকায় বলি পিতামহকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিন্তু অশ্রুপূর্ণনেত্রে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিলেন। প্রহ্লাদ শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন,—"আপনি এই বলিকে ইন্দ্র-পদবী প্রদান করিয়াছিলেন, আজ আবার উহা হরণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আপনি বলির প্রতি **মহা-অনুগ্রহই** প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বিদ্বান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও শ্রীর মদে মত্ত থাকিলে লোকে মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।"

বলির সহধর্ম্মিণী শ্রীবিন্ধ্যাবলি শ্রীবামনদেবের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে স্তব করিয়া বলিলেন যে, ভগবানই একমাত্র মঙ্গলময়। যাহারা মায়া-মোহিত, তাহারাই শ্রীভগবানের বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা শ্রীবামনদেবকে বলিলেন,—"নিষ্কপট ব্যক্তিগণ ভগবানের শ্রীচরণে জল ও দূর্ব্বাঙ্কুর প্রদান করিয়াই উত্তমা গতি লাভ করেন। এই বলি আপনার পদযুগলে আকতরচিত্তে ত্রিভুবন দান করিয়াও কিজন্য বন্ধন-দুঃখভাগী হইবেন?"

শ্রীভগবান্ সমস্ত জীবজগতের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মাকে বলিলেন, —"মনুষ্য অর্থের মদে মত্ত ও জড়বুদ্ধি হইয়া ত্রিলোক, এমন কি, লোকপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে। তাহারা নিত্য-মঙ্গলের কথা ভুলিয়া যায়। এজন্য আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার

সেইরূপ অর্থ হরণ করিয়া থাকি। লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর ভাগ্যবশে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। সেই মানব-জন্মে যদি কোন ব্যক্তির উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদিতে অহঙ্কার না হয়, তাহা হইলে উহাই জীবের প্রতি আমার অনুগ্রহ। তবে যে আমি ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণকে সম্পদ্ দান করিয়াছিলাম, উহারও কারণ আছে। ইহা দ্বারা আমি লোক-শিক্ষা দিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের বিরোধী অভিমান ও অনম্রতার মূল কারণ—জন্ম, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যাদি থাকা-সত্ত্বেও আমার একান্ত ভক্ত তাহাতে মুগ্ধ হন না। বলিরাজ দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে। সে ঐশ্বর্য্যাদি-রহিত হইয়াও মঙ্গলের পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ধনশূন্য, জনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শত্রুগণের দ্বারা তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুদ্বারা নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াও সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নাই। আমি কপটতা-পূর্ব্বকই তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্য-প্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করে নাই।"

বলির চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই শরণাগতি—বিনা সর্ত্তে অহৈতুক-ভাবে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন। বলি এই আদর্শই শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ কপটতা বা বঞ্চনা করিলেও তাহাতে বঞ্চিত না হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবলি দিতে হইবে। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আপাত-প্রতীয়মান নানা বিপদে পাতিত, ঐশ্বর্য্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধন-পাশে বদ্ধ, এমন কি, সর্ব্বস্ব হরণ

করিলেও, লৌকিক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতার চরম সীমা প্রদর্শন করিলেও তাঁহার শুদ্ধ সেবা-কামী ঐ সকল বিঘ্নের দ্বারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া শ্রীভগবানের সেবায়ই আত্মবলি প্রদান করিলেন।

বহির্ম্মুখ কুলগুরু মহাকর্ম্মনিপুণ ও মহানীতিবিদ্ হইলেও যদি তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে কোনপ্রকারে বাধা প্রদান করেন, এমন কি, অভিশাপাদি প্রদান করিয়াও লৌকিক শ্রীভ্রষ্ট করেন, তথাপি তাহাতে বিচলিত না হইয়া শুদ্ধভক্ত শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন করিবেন। যে গুরু একমাত্র ভোক্তা বিষ্ণুর সেবায় শিষ্যের সর্ব্বস্ব প্রদান না করেন, তিনি গুরু-পদ-বাচ্য নহেন। সেইরূপ ব্যক্তি লৌকিক কুরুগুরু বলিয়া পূজিত হইলেও তাঁহার অসদুপদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদ-পদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণের উপদেষ্টা সদ্‌গুরুর সেবা করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণু জীবের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেই পরম-মঙ্গল। নির্ম্মল চেতন শ্রীভগবানের পাদপদ্মের বলি-স্বরূপ।



মহারাজ অম্বরীষ

মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। এইরূপ ঐশ্বর্য্য জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ হইলেও অম্বরীষ উহাকে স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কারণ, তিনি জানিতেন, ঐ সকল বস্তু নশ্বর। উহাতে আসক্ত হইলে মোহ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে! তিনি ভগবান্ বাসুদেবে ও তাঁহার ভক্তগণে উত্তমা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি এই বিশ্বকে লোষ্ট্রের ন্যায় বোধ করিতেন। তিনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার ভক্তগণের সেবা করিতেন। তাঁহার মন সর্ব্বদা কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত ছিল। বিষয়-চিন্তা তাঁহার চিত্তকে কোনদিনই অধিকার করে নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবর্ণনে তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বক্ষণ রত ছিল; তিনি হস্তদ্বয়ের দ্বারা শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনা করিতেন, ভগবানের কথা-শ্রবণে তাঁহার কর্ণ সর্ব্বক্ষণই নিযুক্ত থাকিত। চক্ষুর্দ্বারা তিনি শ্রীবিষ্ণুর মন্দির, শ্রীবিগ্রহ ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। ভগবান্ মুকুন্দের সেবকগণের শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য তাঁহার স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যবহৃত হইত; শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের তুলসীর ও তাঁহার শ্রীচরণকমলের সৌরভের ঘ্রাণ-গ্রহণের জন্য তাঁহার নাসিকা নিযুক্ত ছিল; তিনি রসনায় ভগবানে নিবেদিত অন্ন

ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না ; তাঁহার চরণযুগল শ্রীবিষ্ণুর তীর্থ-পর্য্যটনে, মস্তক শ্রীহরির শ্রীচরণ-প্রণামে এবং তাঁহার কামনা শ্রীভগবানের বিবিধ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে তিনি যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া প্রহ্লাদাদি ভগবদ্ভক্ত-গণের প্রতি রতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ভগবানে ভক্তিযুক্ত কর্ম্মসমূহ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অনুরাগী ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। তিনি ভক্তিযোগ ও কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগের দ্বারা স্বধর্ম্মা-চরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাহাতেই তিনি গৃহ, পত্নী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও অসীম ধন-ভাণ্ডারে বিন্দুমাত্রও আসক্ত ছিলেন না। ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তজন-সংরক্ষক ও প্রতিকূল ব্যক্তিগণের প্রতি ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের আরাধনার বাসনায় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্বৎসর একাদশীব্রত পালন করিতেছিলেন। কেন না, শ্রীএকাদশী শ্রীভগবানের প্রিয়-তিথি। শ্রীহরিকীর্ত্তনের সহিত শুদ্ধভক্তসঙ্ঘে উপবাসাদি দ্বারা এই তিথি পালন করিলে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ হয় এবং উহাতে অচিরেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। এইজন্য মহাজনগণ একাদশীকে 'মাধব-তিথি ভক্তিজননী' বলিয়াছেন।

মহারাজ অম্বরীষ একদিন ত্রিরাত্র উপবাসের পর কার্ত্তিকমাসে যমুনাতে স্নান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছিলেন।

তৎপরে গৃহে সমাগত সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ সামগ্রী দান ও ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে পারণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন সময় যোগবিভূতিশালী দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে অম্বরীষের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষ দুর্ব্বাসাকে ভোজনার্থ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া দুর্ব্বাসা মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিতে যমুনার তীরে গমন করিলেন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে আর অর্দ্ধমুহূর্ত্ত-মাত্র দ্বাদশী তিথি অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যেই পারণ করিতে হইবে, নতুবা ব্রতের অনুষ্ঠানে দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের সহিত কি কর্ত্তব্য বিচার করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, মহারাজ কেবল জলপান করিয়া ব্রত রক্ষা করিবেন। কারণ, বিপ্রগণ জলপানকে ভক্ষণ ও অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে মহারাজ অম্বরীষ জল পান করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন ও দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসা রাজার জলপানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যমুনা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধে কম্পিত-কলেবরে ভ্রুকুটী করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অম্বরীষকে বলিতে লাগিলেন,—"অহো! এই ব্যক্তি কিরূপ ধনমদে মত্ত! সে নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া এই ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিল! এই ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে

ভোজন না করাইয়াই পূর্বে ভোজন করিয়াছে! ইহার দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করিতেছি।" ইহা বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখনই তিনি জটা ছিন্ন করিয়া অম্বরীষকে বধ করিবার জন্য কালাগ্নিতুল্য এক কৃত্যা (দেবতা) নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ জ্বলন্ত কৃত্যা হস্তে অসি ধারণ করিয়া অম্বরীষের অভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ সেই স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। ভক্ত-রক্ষক সুদর্শন-চক্র আবির্ভূত হইয়া সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ঐ চক্র দুর্ব্বাসার দিকে দ্রুত ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা যে-স্থানে ধাবিত হইলেন, সুদর্শন-চক্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুর্ব্বাসা আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদিক্, আকাশ, পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোক-পালদিগের বিভিন্ন লোক ও স্বর্গাদি ত্রিভুবনে গমন করিলেন। যেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দুঃসহ তেজোময় সুদর্শন-চক্রকে দেখিতে পাইলেন। দুর্ব্বাসা যখন কোন স্থানেই আশ্রয় পাইলেন না, তখন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই দুঃসহ তেজোময় চক্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রহ্মাকে প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—"বিষ্ণুর ভ্রূভঙ্গীমাত্রে বিশ্বের সহিত ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হয়। দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, শিব ও শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ, সকলেই বিষ্ণুর অধীন। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর আদেশ অবনত-মস্তকে বহন করিতেছেন। সেই বিষ্ণুর ভক্তের প্রতি যে দ্রোহ

করে, তাহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" তখন দুর্ব্বাসা বিষ্ণুর চক্রের তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া শিবের নিকট কৈলাসে উপনীত হইলেন। মহাদেব কহিলেন,—"ভগবন্ শ্রীহরির সুদর্শন-চক্র আমাদেরও দুর্ব্বিসহ। আমরা সকলেই শ্রীহরির অধীন। আমরাও বিষ্ণুমায়ায় আবৃত হইয়া সেই মায়াকে জানিতে পারি নাই। অতএব বিষ্ণু ব্যতীত সুদর্শন চক্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আমাদের নাই।" শিবের নিকটও নিরাশ হইয়া দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। তিনি শ্রীভগবানের পাদমূলে নিপতিত হইয়া নিজের অপরাধ স্বীকার ও তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং চক্রের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তের অধীন। শিবাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, আমিও সেইরূপ ভক্তের অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমি ভক্তের নিকট আমার সমস্ত স্বতন্ত্রতা বিক্রয় করিয়াছি। যে-সকল ভক্তের মুক্তি-পর্য্যন্ত বাসনা নাই, সেই সকল ভক্ত আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়। সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজের স্বরূপগত আনন্দ ও ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পত্তিরও অভিলাষ করি না। **যে-সকল সাধু, গৃহ, পত্নী, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহলোক ও পরলোক—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত**

হইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তি-প্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন। আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিপূর্ণ। তাঁহাদের নিকট চতুর্ব্বিধ মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, নশ্বর স্বর্গাদির কথা আর কি? সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না। আমিও, তাঁহাদের ব্যতীত আর কিছুই জানি না। বিপ্র! তোমার আত্মরক্ষার একটী উপায় আছে। তুমি যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াচ, যদি তিনি ক্ষমা করেন, তবেই তোমার মঙ্গল লাভ হইতে পারে। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, বিলম্ব করিও না। বিপ্রগণের তপস্যা ও বিদ্যা দুইটীই মঙ্গলজনক। কিন্তু দুর্ব্বিনীত ব্যক্তির পক্ষে ঐ দুইটীই বিপরীত ফল প্রসব করে।"

শ্রীনারায়ণের আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকটে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধারণ করিলেন। বৈষ্ণব-বর অম্বরীষ ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে স্তব করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে শ্রীহরির চক্রের স্তব করিয়া তাঁহাকে দুর্ব্বাসার প্রতি শান্ত ভাব ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবদ্‌ভক্তের প্রার্থনায় সুদর্শন-চক্র শান্ত-ভাব ধারণ করিলেন; দুর্ব্বাসা এইরূপ প্রভাব দর্শন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আমি আজ বিষ্ণুভক্তগণের মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ

করিলাম। আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনাই করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীবাসুদেবের সেবা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সাধু-পুরুষের অসাধ্য ও দুস্ত্যাজ্য কিছুই নাই। যাঁহার নাম-মাত্র শ্রবণে জীব নির্ম্মল হয়, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তদিগের কোন বস্তুরই অভাব নাই। আপনি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি রক্ষিত হইলাম।"

অম্বরীষ দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় ভোজন করেন নাই। তিনি দুর্ব্বাসাকে বিচিত্র উপকরণযুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। মহারাজ অম্বরীষ শ্রীবাসুদেবের প্রতি এইরূপ ভক্তিযোগ বিধান করিতেন যে, সেই ভক্তির প্রভাবে তিনি ব্রহ্মার পদবীকেও নরকতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅম্বরীষের চরিত্রে শুদ্ধভক্তের জীবনের আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্ত সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইলেও বিষয়-বৈভবে আসক্ত হন না। তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের অহৈতুকী সেবা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তের 'ভোক্তা' অভিমান নাই। সেবকানুসেবকানুভবই তাঁহার সমগ্র চিত্তরাজ্য অধিকার করিয়াছে। তাঁহার কায়-মনোবাক্য—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ, সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত। তিনি শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে অবস্থান করিয়া হরিসেবা শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে মুক্তি-পদবী হইতেও অধিকতর শ্লাঘ্য বলিয়া বিচার করেন। সালোক্যাদি মুক্তিকে

তুচ্ছ করিয়া তিনি শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা আকাঙ্ক্ষা করেন। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্ত বনেই থাকুন, আর মহারাজ চক্রবর্ত্তীর বেশে প্রাসাদেই বাস করুন, তিনি অজিত ভগবান্‌কে জয় করিয়াছেন। এইরূপে ভগবদ্ভক্তকে উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য অথবা সৌন্দর্য্যাদি-মদে মত্ত হইয়া কোনরূপে অবমাননা করিলে, সেই বৈষ্ণবাপরাধের ফলে কোনও দিন ভগবানের কৃপা বা শ্রীহরিনামের কৃপা-লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ বা শ্রীহরিনামের চরণে অপরাধ করিলে ভগবদ্ভক্ত তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিলে তাঁহার নামাবতারের কৃপায় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি ঘটে, কিন্তু **'শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ হইলে শ্রীভগবান্ বা শ্রীনাম কেহই অপরাধীকে রক্ষা করেন না।'** যে-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, যদি তিনি কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই মঙ্গল লাভ হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশচীমাতার আদর্শের দ্বারা ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত ম ২২।৩৩

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?

—শ্রীচৈতন্যভাগবত অ ৪।৩৮০

অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র এই বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব ও কি করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা পত্নীহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা ও যতপ্রকার পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ গুরুতর। কারণ, পাতক-সমূহ দেহ ও মনের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু অপরাধ আত্মাকে — চৈতন্যের বৃত্তিকে আবৃত করিয়া দেয়। অপরাধের মধ্যে আবার বৈষ্ণবাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। কারণ, শ্রীভক্তিদেবীর চরণে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, শ্রীনামের চরণে, শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিলে একমাত্র যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিলে কোথাও আর আশ্রয়ের স্থান বা উদ্ধারের উপায় থাকে না। যাহাতে কোনরূপে মহতের চরণে অপরাধ না হয়, সেজন্য সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।



সৌভরি ঋষি

সৌভরি ঋষি মহান্ তপস্বী, যোগী, ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন ছিলেন। এক সময় তিনি যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী বৃহৎ মৎস্য গ্রাম্যধর্ম্মে আসক্ত হইয়া আনন্দানুভব করিতেছে। ইহা দেখিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তপস্বীরও হৃদয়ে সংসার-বাসনার উদ্রেক হইল। তিনি তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন ও তখনই মথুরায় মহারাজ মান্ধাতার প্রাসাদে আগমন করিলেন। মান্ধাতার পঞ্চাশটী সুন্দরী কন্যা ছিল। সৌভরি মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের জন্য তাঁহার একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন যে, স্বয়ম্বরে তাঁহার যে-কোন কন্যাকে ঋষি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া সৌভরি মনে মনে বিচার করিলেন যে, তিনি জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ ও পলিতকেশ। তাঁহার অঙ্গের চর্ম্মসমূহ শ্লথ হইয়াছে, মস্তক সর্ব্বদা কম্পিত হইয়াছে, তাহাতে আবার তিনি তাপস। কোন যুবতীই এইরূপ ব্যক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই রাজা মান্ধাতা স্বয়ম্বরের কথা বলিয়া ঋষিকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঋষি তপস্যা দ্বারা আপনাকে সর্ব্বাগ্রে সুরূপ-সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন—যাহাতে রাজকন্যাগণের

কেন,• সুরপত্নীগণেরও দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। সৌভরি যোগবিভূতি-বলে অচিরেই সুরূপ ও যৌবন লাভ করিলেন। সৌভরিকে এইরূপ সুপুরুষ দেখিয়া মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। তাহারা সহোদরা ভগ্নী হইলেও সৌভরির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলই 'ইনি আমার স্বামী, তোমার নহে'—এইরূপ বলিয়া মহা-কলহ উপস্থিত করিল।

সৌভরি উৎকট তপস্যা-প্রভাবে বহু ভোগ-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, দাস-দাসী, বহু উপবন, সরোবর, সুগন্ধি কহ্লার-বন, কূজনরত পক্ষিবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, উত্তম পালঙ্ক, শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, চন্দনাদি অনুলেপন, মালিকা, পুষ্প, ভোজ্যদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুতে পরিবৃত হইয়া তিনি পত্নীগণের সহিত সর্ব্বক্ষণ বিহার করিতে লাগিলেন, সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতাও সৌভরির ঐপ্রকার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি যে নিজেকে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, উহা পরিত্যাগ করিলেন। সৌভরি গৃহের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ পত্নীসঙ্গ-সুখ ও বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে একবিন্দুও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ঘৃতাহুতি দ্বারা কি অগ্নি শান্ত হইতে পারে? কামোপভোগের দ্বারা কখনই কামের পরিতৃপ্তি হয় না। উহাতে জ্বালা আরও বর্দ্ধিতই হয়। এ-পর্য্যন্ত কেহই কামোপভোগের দ্বারা কামাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। একদিন

সৌভরি নির্জ্জনে বসিয়া বিচার করিলেন,—গ্রাম্যধর্ম্মনিরত মৎস্যের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ পাণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, প্রাচীন, মন্ত্রাচার্য্য ও তপস্বীর বুদ্ধি কিরূপ ভ্রষ্ট হইয়াছে! তিনি তপস্যা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন! একটী ইতরপ্রাণীর পশু-স্বভাব তাঁহার সমস্ত সদ্বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে! অসৎসংসর্গের কি ভীষণ প্রভাব! অথবা তাঁহার এই পতনের কারণ তিনি নিজেই। ভগবান্ তাঁহাকে যে অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন দান করিয়াছিলেন, তিনি উহার অপব্যবহার করিয়া নরকে পতিত হইয়াছেন। সাধুজনোচিত ব্রত ধারণ করিয়া যমুনার জলে অবগাহন করিলে কোথায় জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পশু-বৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে! ভগবানের প্রিয়া বৈষ্ণবী যমুনার মঙ্গলময়ী কৃপা-লাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার জলচরের অসৎসঙ্গ হইয়া গিয়াছে! তপস্যা করিতে করিতে কোথায় চিত্তশুদ্ধি ও হরি-ভক্তির উদয় হইবে, তৎপরিবর্ত্তে চিত্ত-বিকৃতি ও পশু-বৃত্তির উদয় হইয়াছে! এজন্য যাঁহারা আত্মমঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা কখনও দাম্পত্যধর্ম্মরত ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবেন না। ইন্দ্রিয়-সমূহকে কখনও বাহ্য-বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না। নিজের ত্যাগ ও তপস্যার প্রতি নির্ভর করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিবেন না। ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। তাঁহারাই পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন। সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবেন। নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নিজে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থান

করাও সঙ্গত নহে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থানই চরম কল্যাণ-লাভের উপায়।

সৌভরি নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বে আমি একাকী নিৰ্জ্জনে তপস্যা-পরায়ণ ছিলাম। পরে জলের মধ্যে মৎস্যের দুঃসঙ্গ হওয়ায় বিবাহ করিয়া পঞ্চাশৎ হইলাম। প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে শতপুত্র উৎপন্ন করিয়া এখন পঞ্চসহস্র হইয়াছি। মায়া দ্বারা আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে, এখন বিষয়ে পুরুষার্থ-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে! আমি ইহলোক ও পরলোক-বিষয়ক বাসনা-কামনার অন্ত পাইতেছি না। হায়! হায়! দুঃসঙ্গের কি প্রভাব!" এইরূপ বিচার করিয়া সৌভরি বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিল। সৌভরি সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের প্রসঙ্গ, ভগবানের পূজা, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী-গণও পতির অনুসরণ করিয়া ভগবানের সেবায় নিবিষ্ট হইলেন।

সৌভরির চরিত্রের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যোগবল, তপোবল, নিৰ্জ্জন-ভজনবল প্রভৃতি কোনটীই জীবকে কামের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অপ্রাকৃত কামদেবের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীচরণে **পূর্ণানুগত্য ও শরণাগতি** ব্যতীত জীবের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। মহা-তপস্বী, জ্ঞানী, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের পক্ষেও গ্রাম্যধর্ম্মরত মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর সঙ্গ করা কখনও সঙ্গত নহে।

সৌভরির আদর্শ দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তি কল্পনা করেন যে, উক্ত ঋষির যেরূপ ভোগ করিতে করিতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ আমরাও ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ ও মঙ্গলের পথে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু ভজন-বিজ্ঞানবিৎ সাধুগণ প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ভোগ করিতে করিতে ত্যাগ বা নির্ব্বেদের ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা প্রায় সকল-ক্ষেত্রেই নির্ব্বিশেষ-বিচারে লইয়া যায়। উহাতে আত্মার নিত্য-বৃত্তির বিলোপ সাধিত হয়। বিল্বমঙ্গল, অজামিল প্রভৃতির আকস্মিক দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া যাহারা ভোগ করিতে করিতে নির্ব্বেদ লাভ করিবার কল্পনা করে, তাহারা ঐ সকল ভক্তের চরণে অপরাধ ও নামবলে ভোগ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য অপরাধপঙ্কে পতিত হইয়া মঙ্গল হইতে চিরভ্রষ্ট হয়। হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় ভোগবাসনার উদয় হইলেই ঐ সকল মহাপুরুষের অবৈধ অনুকরণ করিয়া জীব ভোগপঙ্কে নিমগ্ন হয়। ইহারা তাহা হইতে কখনই উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। অতএব নির্ব্বিশেষ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তের সেবা ও সঙ্গই পরম মঙ্গলজনক।



রাজর্ষি খট্বাঙ্গ

রাজা বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ দেবতাগণের অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজক ও ভক্ত ছিলেন। যুদ্ধে খট্বাঙ্গকে কেহই জয় করিতে পারিতেন না। তিনি দেবতাগণের ইচ্ছায় যুদ্ধে দৈত্যাদিগকে নিহত করেন। ইহাতে দেবতাগণ খট্বাঙ্গের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। খট্বাঙ্গ সর্ব্বাগ্রে দেবতাগণের নিকট জানিতে চাহেন যে, তাঁহার আয়ুঃ আর কতকাল অবশিষ্ট আছে, তাহা বুঝিয়া তিনি বর প্রার্থনা করিবেন। দেবতাগণ খট্বাঙ্গকে বলেন যে, মাত্র মুহূর্ত্তকাল তাঁহার আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে। ইহা জানিতে পারিয়াই তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া দেবতাদিগের প্রদত্ত বিমানযোগে নিজের রাজধানীতে আগমন করেন এবং দেবতাগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করেন।

খট্বাঙ্গ বিচার করিলেন, ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতাবৃন্দ আমার যে-সকল কামনা পূরণ করিবেন, তাহাতে আমার নিত্য-মঙ্গল কি হইবে? তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম পরিপূরণ করিতে পারেন, তাহাতে কিরূপে ভগবানে শুদ্ধভক্তিযোগ উদিত হইবে? দেবতাগণেরও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদেরই

হৃদয়ের মধ্যে বর্ত্তমান অন্তর্য্যামী শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না। ভগবানের মায়া-দ্বারা বিরচিত গন্ধর্ব্বপুর-সদৃশ বিষয়ে বদ্ধজীবের চিত্তের আসক্তি স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা-দ্বারা সেই আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমি ভক্তিযোগ-সহকারে তাঁহাতেই শরণাপন্ন হইতেছি। শ্রীবাসুদেবের দাস্য ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গলের আর উপায় নাই। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাসুদেবে শরণাগতিই জীবের একমাত্র কামনার বস্তু। অন্য যে-কোন কামনা কেবল সংসারের হেতু।

জীবনের একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রাজর্ষি খট্বাঙ্গ এইরূপ বিচার করিয়া দেবতান্তর-পূজা, বিষয়-বৈভব, ধর্ম্মার্থ-কাম, বরপ্রাপ্তির লোভ ও দেহাত্মবোধ • সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র শ্রীবাসুদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং একমুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের নিত্যদাস্য লাভ করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি খট্বাঙ্গের চরিত্র হইতে দুইটি মহতী শিক্ষা পাওয়া যায়। জীবন—অনিত্য। কে জানে কাহার আয়ুর কতটুকু সময় অবশিষ্ট আছে? অতএব, পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুর জন্য চেষ্টা না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই একমাত্র শ্রীবাসুদেবের ভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। জীবনের অধিক-কাল বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে, সুতরাং এখন আর কি করিয়া ভগবদ্ভজন হইবে? অথবা এখন কৌমার বা যৌবনকাল; সুতরাং জীবনের দীর্ঘকাল অবশিষ্ট আছে, এইরূপ কোন বিচারেই সময়-ক্ষেপ না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই প্রত্যেকের হরিভজনে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ

ঐকান্তিকতা থাকিলে এক মুহূর্ত্তেও হরিভজনে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। যে-মুহূর্ত্ত হরিভজন ব্যতীত অন্যকার্য্যে ব্যয়িত হইবে, তাহাই বিফল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই আগামী কল্য বা ভবিষ্যতের জন্য শ্রীবাসুদেবের ভজন রাখিয়া দেন না। বিষয়-লাভের চেষ্টায় কাল হরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু হরিসেবা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা উচিত নহে। জীবনের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলে সেই সময় ত' আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। যে-সময়টুকু হস্তে আছে, তাহারও সদ্ব্যবহার করা যাইবে না। অতএব, এই মুহূর্ত্ত হইতেই যে-কোন অবস্থায় হরিভজন আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

আর একটি শিক্ষা এই যে, স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না ; ভক্তি ত' দূরের কথা। শ্রীবাসুদেবের ভজনেই প্রেমভক্তি লাভ হয়। শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র জীবের শরণ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা সালোক্যাদি মুক্তিকেও ভগবদ্ভক্তগণ উপেক্ষা করিয়া কেবলা প্রেমভক্তির প্রার্থনা করেন। যে দেবতা উপস্থিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারেন, তিনি দেবতা-পদ-বাচ্য নহেন। একমাত্র শ্রীবাসুদেবই জীবকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি প্রদান করিয়া দেবতাগণ জীবকে কপট-কৃপা করেন, যদি তাঁহারা শ্রীবাসুদেবের প্রতি উন্মুখ করিয়া দেন তবেই উহাকে অকপট-কৃপা বলা যায়।

ভৃগু

ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। এক সময়ে ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেন। যিনি ভৃগুর নিত্য-আরাধ্য, ভৃগু অনুক্ষণ হৃদয়ে যাঁহার চিন্তা করেন, সেই প্রভুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াও ভৃগু কিরূপে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব থাকিতে পারেন, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। কেহ কেহ ভ্রম বশতঃ মনে করেন, বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য ভৃগুর পদ-চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা ও অম্বরীষের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, দুর্ব্বাসা যখন বিষ্ণুর নিকট অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন,—যে-ব্যক্তি বৈষ্ণবের অবমাননা করে, তাহাকে ক্ষমা করিবার শক্তি ভগবানেরও নাই। কারণ, বৈষ্ণব—ভগবানের হৃদয়, আর ভগবান্—বৈষ্ণবের হৃদয়। ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও বড়। ভগবানের নিকট অপরাধ অপেক্ষা ভক্তের নিকট অপরাধ আরও ভয়ঙ্কর। ভগবানের নিকট অপরাধ করিলে হরিনাম তাহা মোচন করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তের নিকট অপরাধ থাকিলে স্বয়ং ভগবান্, হরিনাম বা গুরুদেবও রক্ষা করিতে পারেন না। এজন্য ব্রাহ্মণ-দুর্ব্বাসাকে অম্বরীষের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

অতএব ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। সেই **বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুর পদাঘাত সর্ব্বক্ষণ বক্ষে ধারণ করিতেছেন।** ভৃগু যে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবানের গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশের জন্য। ইহা ভগবানেরই সেবা। ভৃগু নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, দাম্ভিকতা বা কূলের অহঙ্কার প্রচার করিবার জন্য ঐরূপ কার্য্য করেন নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি যে অনন্ত ক্ষমাধার, তিনি যে ভক্তবৎসল,—ইহা প্রচার করিবার জন্যই ভৃগু ঐরূপ এক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ই ভৃগুর শরীরে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাকে প্রেরণা দান করিয়া ভক্তের মহিমা প্রকাশের জন্য ভৃগুর দ্বারা ঐ লীলা করাইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন-কালে মহা-মহান্ ঋষিগণ সরস্বতী নদীর তীরে এক মহা-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ-সভায় সকলেই পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। কোনও পুরাণে ব্রহ্মার মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে; কোন পুরাণে বা শিবকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; আবার কোন পুরাণে বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঋষিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হইল। আবার কেহ কেহ সকল মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য সকলের মতেরই একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিলেন; তাহাতে আর একটী নূতন মতের উদয় হইল। তাঁহারা বলিলেন,—"পরস্পর মতভেদ করিয়া লাভ কি? 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র

কাছে, যা'র যা'র উপাস্য তা'র তা'র কাছে'। এই বিচার করিয়া সকলই সমান—এইরূপ এক মতের সৃষ্টি করা হইল। ইহাকেই নির্ব্বিশেষ-মত বলে। বর্ত্তমানে যে তথা-কথিত সমন্বয়বাদ প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সেই প্রাচীন নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রতিধ্বনি। ইহাই গোঁজামিল দেওয়া জগা-খিচুড়ীবাদ। এই বাদে মুড়ি-মিছরি সবই সমান; ভগবানের নিকট হইতে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত কোন দেবতা, জীব বা স্বয়ং ভগবান্‌কে এই মতে একাকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ঋষিগণ তাঁহাদের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগুকে ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার ভার দিলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ব্রহ্মাকে 'পিতা বা পূজ্য' বলিয়া প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না; বরং অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত অবস্থান করিলেন। ব্রহ্মা পুত্রের এইরূপ অনাদর ও দুর্ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; মনে হইল যেন ভৃগুকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। ভৃগু পিতার ঐরূপ অগ্নি-মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন।

ভৃগু ব্রহ্মাকে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এবার কৈলাস-পর্ব্বতে গিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিব পার্ব্বতীর সহিত উত্থিত হইয়া ভৃগুকে আদর করিলেন। শিব ভৃগুকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন দিতে গেলেন। কিন্তু ভৃগু বলিলেন,—"মহেশ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। তুমি পাষণ্ডবেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; আর ভূত,

প্রেত, পিশাচ, অস্পৃশ্য ও পাষণ্ড ব্যক্তিগণকে তোমার নিকটে রাখিয়াছ। তুমি উন্মার্গগামী। ভস্ম ও অস্থি-ধারণ কোন্ শাস্ত্রে সদাচার বলিয়া লিখিত আছে? তোমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। তুমি আমার নিকট হইতে দূরে থাক।”

ভৃগু উহা কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন; কারণ, ভৃগুর ন্যায় বৈষ্ণব কখনও শিবের নিন্দা করিতে পারেন না।

ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পার্ব্বতী দেবী রুদ্রের হস্ত ধারণ করিয়া ও চরণে ধরিয়া অনেক বুঝাইয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে শিবকে বিরত করিলেন। ভৃগু তখন বৈকুণ্ঠের দিকে চলিলেন।

ভৃগু বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণু রত্ন-পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; আর লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর শ্রীচরণ-সেবা করিতেছেন। ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ আসিয়া ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে এক পদাঘাত করিলেন।

ভৃগুকে দেখিয়াই বিষ্ণু শয্যা হইতে উঠিলেন। বিষ্ণু ভৃগুকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত আনন্দভরে লক্ষ্মীর সহিত একত্রিত হইয়া ভৃগুর চরণ ধৌত করিতে লাগিলেন; ভৃগুকে উত্তম আসনে বসাইয়া নিজ-হস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন এবং অপ-রাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিষ্ণু ভৃগুকে বলিলেন,—বৈষ্ণবের শ্রীচরণ-জল মলিন-তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকে। আমার দেহে

যত ব্রহ্মাণ্ড আছে ও লোকপাল বাস করিতেছেন, সকলেই ভক্তের পদজল পাইয়া পবিত্র হইয়াছেন।" বিষ্ণু ভক্তের এই চরিত্রকে চিরকাল স্মরণ রাখিবার জন্য নিজের বক্ষে ভক্তের চরণ-চিহ্ন ধারণ করিলেন। এজন্য তাঁহার 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' নাম হইল।

বিষ্ণুর এইরূপ ব্যবহারে ভৃগু বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বিষ্ণুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভৃগুর শরীরে প্রেমের বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভৃগু সেই মুনিগণের সভায় ফিরিয়া গিয়া ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর ব্যবহারের কথা সকলকে বলিলেন। ভৃগু ত্রিসত্য করিয়া সকলকে কহিলেন—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন যাঁহার অধিকার ॥
কর্ত্তা, হর্ত্তা, রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥
ধর্ম্ম-জ্ঞান, পুণ্য-কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ, কৃষ্ণের বিজয় ॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত অ ৯।৩৭০-৩৭৪

অবধূত ও চব্বিশ গুরু

এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এক অবধূতের ও যদুর উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। যদু এক অবধূত ব্রাহ্মণকে পরম-সুখে পাগলের মত ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ সন্তোষ ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যদুকে জানাইলেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে চব্বিশ জন শিক্ষা-গুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণ হইতেই তিনি এইরূপ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। (১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতঙ্গ, (১২) ভৃঙ্গ, (১৩) মাতঙ্গ, (১৪) মধুচোর, (১৫) কুরঙ্গ, (১৬) মীন, (১৭) 'পিঙ্গলা' নাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরর পক্ষী (কুরল পাখী), (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণনির্ম্মাতা লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) মাকড়সা ও (২৪) কুমারিকা পোকা—এই চব্বিশ জনকে তিনি গুরু করিয়াছেন।

(১) অবধূত ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নিকট হইতে ক্ষমাগুণ শিক্ষা করিয়াছেন। পৃথিবীর উপর লোকে কতপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, পৃথিবীকে ইচ্ছামত খনন ও কর্ষণ করিয়া নানা-প্রকারে ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবী নিশ্চল হইয়া লোকের

উপকারই করিতেছে; অতএব প্রাণিসমূহ নানা উৎপীড়ন করিলেও উহাকে দৈব-কার্য্য জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। অত্যাচারীর অত্যাচারকে ক্ষমা করিয়া তাহার উপকার করাই উচিত। কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্টে অসহিষ্ণু হওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে।

সাধু ব্যক্তি পৃথিবী হইতে জাত বৃক্ষ ও পর্ব্বতের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বৃক্ষ, তৃণ ও পর্ব্বত পৃথিবী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরের কত উপকার করিয়া থাকে। বৃক্ষ ছায়া ও সুমিষ্ট ফল দান করে, তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও সে সুমিষ্ট ফল-দানে বিরত হয় না। তাহাকে যখন কেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলে, তখনও সে ঐরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া থাকে এবং রৌদ্র-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিয়াও তাহার দেহ-দ্বারা শত্রুর উপকার করে। অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও সে অপকারীর উপকার করিতে ত্রুটী করে না।

তৃণকে গো-গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু সর্ব্বদা পদাঘাত করিলেও তৃণ তাহাদের উপকার করিয়া থাকে। শুষ্ক হইয়াও তৃণ লোকের উপকার করে।

পর্ব্বত নির্ঝরিণী-দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার করিয়া থাকে। কত ওষধি তাহার বক্ষে জন্মগ্রহণ করে। হিংস্র পশু তাহার উপর বিচরণ করিলেও সে কাহারও হিংসা করে না। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল হইতে পারিলে হরিভজন সম্ভব হয়।

(২) বায়ুর নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, বায়ুর ন্যায় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকিতে হইবে। বায়ু যেরূপ সকল গন্ধই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু কোন গন্ধের দ্বারাই লিপ্ত হইয়া নিজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যিনি মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনিও দেহের ধর্ম্মসমূহে লিপ্ত না হইয়া অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকিবেন।

(৩) আকাশের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, বায়ুপ্রেরিত মেঘের দ্বারা আকাশ যেরূপ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ কাহারও পৃথিবী ও দেহের ধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

(৪) জলের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, সাধুপুরুষের স্বভাব জলের ন্যায় নির্ম্মল, স্বাভাবিক স্নিগ্ধ, মধুর। তিনি দর্শন, স্পর্শন ও ভগবানের কীর্ত্তনের দ্বারা সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

(৫) অগ্নির নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, অগ্নি যেরূপ সকল বস্তুকে শোধন করিয়া উহার মল স্বয়ং গ্রহণ করে না, তদ্রূপ সাধুও পতিতপাবন, তিনি কখনও পতিত হন না। অগ্নির ন্যায় সকল বস্তু ভোজন করিলেও অর্থাৎ দৈবাৎ যদি সাধু ব্যক্তির কোন নিষিদ্ধ ব্যাপারও দেখা যায়, তাহা হইলেও তিনি কোনও মলিনতা প্রাপ্ত হন না, উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকেন এবং সকলকে শোধন করেন। ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সাধু নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করেন না; আবার কোন সময় লোক-শিক্ষার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় নিজ-

মহিমা বিস্তার করেন। কখনও গুরুর কার্য্য করিয়া লোকের মঙ্গল করেন। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি আছে; কিন্তু সাধারণ লোক তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবও সাধুর স্বরূপ সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারে না।

(৬) চন্দ্রের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, কালের প্রভাবে যেরূপ চন্দ্রের কলা-সমূহেরই হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রের কোনরূপ বিকার হয় না, সেইরূপ জন্ম হইতে মরণ-পর্য্যন্ত দেহেরই বিকার ঘটিয়া থাকে; আত্মার কোনরূপ বিকার ঘটে না।

(৭) সূর্য্যের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর জলসমূহ কিরণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতেই বর্ষণ করে, ভক্তগণও সেইরূপ বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিলেও বিষয়ের দ্বারা আসক্ত হন না। সূর্য্য স্বপ্রকাশ ও নিত্য-স্থির। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে নিত্যই উদিত হওয়ায় মূর্খ লোকেরাই মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে পারে—পূর্ব্বদিকই সূর্য্যের জননী; কিন্তু কোন সুধী ব্যক্তিই পূর্ব্বদিককে সূর্য্যের জননী বলেন না,—পৃথিবীর ভ্রমণকালে পৃথিবীস্থিত দর্শকের ও তাহার চক্ষুর অবস্থান-ভেদে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত-গমন বা অতি ক্ষুদ্র মেঘের দ্বারা আবরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

(৮) পৃথিবীর কোন বদ্ধজীব বা বস্তুর সহিত অতিশয় স্নেহ বা অতিশয় আসক্তি কর্ত্তব্য নহে,—ইহা তিনি কপোতের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কোন এক কপোত বনে এক

বৃক্ষের উপর বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত তথায় কএক বৎসর বাস করিতেছিল। একজন আর একজনকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না; উভয়েই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, আলাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদি কার্য্য করিত। কপোতী যাহা চাহিত, কপোত অতিকষ্ট-সাধ্য হইলেও তাহা আনিয়া দিত। কালক্রমে কপোতী অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিল এবং শাবক-গণের মধুর শব্দে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে লাগিল। কপোত ও কপোতী উভয়েই সন্তানগণের পালনের জন্য চেষ্টা করিতে কোন ত্রুটী করিল না। একদিন উহারা উভয়েই শিশুদের খাদ্য-সংগ্রহের জন্য অন্যত্র গমন করিয়া-ছিল, এমন সময় এক ব্যাধ বনের মধ্যে কপোত-শিশুগুলিকে দেখিয়া উহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিল। কপোত-কপোতী ফিরিয়া আসিয়া শাবকগণকে জালবদ্ধ ও ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কপোতী রোদন করিতে করিতে শাবক-গণের দিকে ধাবিত হইল এবং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, কপোতও সন্তানদিগকে ও প্রাণাধিকা পত্নীকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং স্ত্রীপুত্রাদিকে জালে আবদ্ধ, মরণোন্মুখ ও মুক্তির জন্য চেষ্টাযুক্ত-সত্ত্বেও অসহায় দর্শন করিয়া নিজেও জালের মধ্যে গিয়া পতিত হইল। ব্যাধ সকলকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কপোতের ন্যায় এইরূপ ইন্দ্রিয়সুখে নিরত বহু পোষ্যযুক্ত ব্যক্তিও পোষ্যগণের পালনে আসক্ত হইয়া অবশেষে আত্মীয়-

স্বজনের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে-ব্যক্তি মুক্তির দ্বার মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও কপোতের ন্যায় গৃহধর্ম্মেই আসক্ত হয়, সে মঙ্গলের পথে আরোহণের ভাণ করিলেও পণ্ডিতগণ তাহাকে ভবকূপে পতিত বলিয়াই জানেন।

(৯) অজগর সর্পের নিকট হইতে তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসে স্বাদু বা অস্বাদু, প্রচুর বা অল্প—যখন যেরূপ খাদ্যদ্রব্য লাভ হয়, তদ্দারাই তখন কোনরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ভগবানের সেবায়ই নিযুক্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভগবানে শরণাগত হইয়া নিজের ভোগের চেষ্টায় অচঞ্চল থাকিয়া গুরু ও ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কোন ভোজনের দ্রব্য না পাওয়া গেলেও ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক ভগবানেরই সেবা করিতে হইবে। যাহারা উদরের বা জিহ্বার লোভে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তাহারা কখনও কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারে না।

(১০) সমুদ্রের নিকট হইতে তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, মুনি বাহিরে প্রসন্ন, অন্তরে গম্ভীর, ইয়ত্তা-রহিত, অলঙ্ঘনীয়, দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও অবিকৃত হইয়া নিশ্চল সাগরের মত অবস্থান করিবেন। সমুদ্রকে যেরূপ মাপা যায় না, ভগবানের ভক্তকেও কেহ তদ্রূপ মাপিয়া লইতে পারে না। অজ্ঞ বদ্ধজীব-গণ মুক্ত পুরুষগণের অতল গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে অসমর্থ।

সমুদ্র যেরূপ বর্ষাকালে বহু নদ-নদীর সঙ্গ লাভ করিয়াও সীমা অতিক্রম করে না, অথবা গ্রীষ্মকালে উহাদের সঙ্গ না

পাইলেও শুষ্ক হইয়া যায় না, ভগবদ্ভক্তও সেইরূপ পৃথিবীর কোন বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ বা পার্থিব-বস্তুর অভাবে অপূর্ণ হন না। তাঁহারা সর্ব্বকালেই পূর্ণ, মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ।

(১১) তিনি পতঙ্গের নিকট ইহাই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, পতঙ্গ প্রদীপের আলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া উহাকে ভোগ করিবার আশায় উহাতেই পুড়িয়া প্রাণ হারায়; বদ্ধজীবও কামিনী, কাঞ্চন, বসন, ভূষণাদি বস্তুর ভোগ-বাসনায় লুব্ধ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(১২) ভৃঙ্গের নিকট তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, ভ্রমর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে অল্প অল্প করিয়া মধু সংগ্রহ করে, মুনি ব্যক্তিও সেই প্রকার নানাস্থান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। মূর্খ ভ্রমর যেরূপ বিশিষ্ট গন্ধ-লোভে একই পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্য্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতেই আবদ্ধ হয়, সেইরূপ যে-ব্যক্তি মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কোন বিষয়ীর গৃহকেই তাহার আশ্রয় মনে করে, সে-ব্যক্তিও উহাতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। ভ্রমর যেরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ সারগ্রাহী ব্যক্তিও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই ভগবানে ভক্তিরূপ সার-কথা গ্রহণ করেন।

ভৃঙ্গ ও মক্ষিকা এই দুইটী প্রাণীর আচরণ হইতে অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ভৃঙ্গ বা ভ্রমর একমাত্র পুষ্পের মধু পান করিয়া থাকে, আর মক্ষিকা সকল বস্তুরই আস্বাদ গ্রহণ করে। পক্ক ও সুমিষ্ট আম্র, কাঁঠাল, তাল ফলের রসের সুগন্ধে ও আস্বা-

কুড়ের পঁচা অন্ন ফেনের দুর্গন্ধে মক্ষিকার সমান-বোধ দৃষ্ট হয়। মক্ষিকা দুষ্ট ক্ষত, গলিত কুষ্ঠ, শব-মাংস শোণিত, পক্ব ব্রণ ও কফে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করে, পরমান্ন-আস্বাদনেও সেই প্রকার সুখানুভব করিয়া থাকে। বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ও চন্দনের সুগন্ধে, অমেধ্য-মাংস ও মেধ্য-গব্যে, অম্ল দ্রব্য বা ফল ও মধুর দ্রব্যে তুল্য বা সমান বিচার করিয়া থাকে।

চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ এই মক্ষিকার প্রতীক, আর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ভৃঙ্গের আদর্শ। নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদিগণ বিষ্ণু ও মায়াবদ্ধজীব, চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি, নির্গুণ শুদ্ধসত্ত্ব ও সগুণ মিশ্রসত্ত্ব, নিরুপাধিক ও সোপাধিক, চিদ্বিলাস-লীলা ও জড়বিলাস-কাম, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, মুক্ত ও বদ্ধ, অথবা সিদ্ধ ও সাধক প্রভৃতিতে তুল্য বা সমান জ্ঞান করেন, ইহাই তথা-কথিত 'সমন্বয়-বাদ'। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে একটি মক্ষিকা একজীবহন্তা ভীষণ বিষধর সর্প অপেক্ষাও মহামারীর মূলরূপে ব্যাপকতরভাবে বহু জীবের প্রাণ-নাশের কারণ হয়। এতদ্ব্যতীত রসবিদ্গণের মতেও শ্রীহরি-পাদপদ্মের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গান মধুপানমত্ত ভক্ত-ভৃঙ্গের ন্যায় নির্ম্মলচিত্ত, শুদ্ধসত্ত্ব, সুধী সাধুগণের মনে সুখের উৎপাদন দূরে থাকুক, সর্ব্বক্ষণ অতন্নিরসন, চিজ্জড়সমন্বয় ও কুতর্কের আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-বস্তুতে প্রাকৃতত্বের আরোপরূপ ছিদ্রান্বেষণের ভ্যান্‌ভ্যানানিতে মর্ম্মপীড়াই উৎপাদন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ এইরূপে মক্ষিকা-বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব দেহ ও আত্মার স্বাস্থ্য-রক্ষণেচ্ছু-মাত্রেরই এই

নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়াবাদরূপ-মক্ষিকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

(১৩) হস্তিনী পাঠাইয়া বন্য হস্তীদিগকে মোহিত করিয়া 'খেদায়' (বেড়ায়) আবদ্ধ করা হয়। হস্তী হস্তিনীর সঙ্গ-লাভের আশায় এইরূপ আবদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য পরাধীনতা স্বীকার করে। বিবেকী পুরুষ কখনও কামিনীর সঙ্গ প্রার্থনা করিবেন না; তাহা হইলে তাহাকেও চিরদিনের জন্য মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হইবে। অবধূত মহাশয় হস্তীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

(১৪) লোভী পুরুষ অতি দুঃখের সহিত অর্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু তাহা দান বা উপভোগ না করিলে অন্য লোকে সেই ধনের সন্ধান পাইয়া উহা হরণ করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকাও অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে; কিন্তু মধু-হরণকারী ব্যক্তি সেই সঞ্চিত মধুর সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিয়া থাকে। অতএব নিজের জন্য সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ভগবদ্ভক্তগণের সেবায়ই মধু অর্থাৎ অর্থ, বিত্তাদি নিযুক্ত করিতে হইবে।

মধু-চোর যেরূপ অপরের সঞ্চিত মধু হরণ করে, সেইরূপ সন্ন্যাসিগণও গৃহস্থগণের দ্বারা অতি কষ্টে অর্জ্জিত অন্ন প্রভৃতির অগ্রভাগ হরিসেবার জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবধূত মধু-চোরের নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

(১৫) কুরঙ্গ ব্যাধের বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আবদ্ধ হয়। ঐরূপ হরিণের ন্যায় কর্ণের অত্যন্ত তৃপ্তিকর হইলেও সন্ন্যাসিগণ

কোন গ্রাম্য-গান বা গ্রাম্য-কথা শ্রবণ করিবেন না। 'রস-গানে'র নামে যে-সকল সঙ্গীত জড়-কাব্যরস বা জড়-আনন্দ-উপভোগের লোভে শ্রবণ করা হয়, তাহা শ্রবণ করিয়াও জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি কামিনীগণের নৃত্য, গীত ও বাদ্যে আসক্ত হইয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব কোনপ্রকার গ্রাম্য আলাপ, গান বা কথা শুনিলে হরিণের ন্যায় বদ্ধ হইতে হইবে, ইহা অবধূত হরিণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন।

(১৬) মৎস্য জিহ্বার লোভে বড়শীতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়; সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও জিহ্বার লোভে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনীষী ব্যক্তিগণ উপবাসী থাকিয়া জিহ্বা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কে শীঘ্রই বশীভূত করেন; কিন্তু উপবাসী ব্যক্তির জিহ্বার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে; এজন্য অন্য ইন্দ্রিয়-সকল জয় করিলেও যে-পর্য্যন্ত জিহ্বার বেগ জয় করিতে না পারা যায়, সে-কাল-পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে না। জিহ্বা-বেগ জয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই জিত হইয়া থাকে। অবধূত মৎস্যের নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

(১৭) অতি প্রাচীনকালে বিদেহ-নগরে 'পিঙ্গলা' নাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। সেই বেশ্যা সন্ধ্যাকালে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া উপ-পতির আশায় বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই পথ দিয়া যত পুরুষ চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককে দেখিয়াই পিঙ্গলা তাহার অভিলাষ-পূরণকারী বলিয়া মনে করিতেছিল। এইরূপ একজনের পর আর একজন পুরুষ

ক্রমে-ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কেহই বেশ্যার আশা পূর্ণ করিল না। তখন পিঙ্গলা অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। সে ধনের লোভে কিরূপভাবে দেহ বিক্রয় করিয়া স্ত্রৈণ, কামাসক্ত ব্যক্তি-গণের সেবা করিয়াছে, নানা বিকারযুক্ত নর-শরীরে আসক্ত হইয়াছে, তাহা অনুতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত জীবের নির্ম্মল আত্মার আর কেহ ভোক্তা নহে, স্বরূপে সকলেই প্রকৃতি, ভগবানই একমাত্র পুরুষ।" তাহার এইরূপ বিচারের উদয় হইল। সে তখন জাগতিক আশা-ভরসাকে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র হরির সেবার কামনাই করিতে লাগিল।

অবধূত পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি শিক্ষা করাই সর্ব্বা-পেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

(১৮) এক কুরর (কুরল) পক্ষী অন্য এক কুরর পক্ষীকে মাংস সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়া উহাকে আক্রমণ করিল, তখন আক্রান্ত পক্ষীটী মাংস পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিল। অবধূত কুরর পক্ষীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, যখন জীব অন্য জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করে, তখন তাহার প্রতি কেহ হিংসা করে না। যাঁহারা ভগবানের প্রেম-লাভে উৎসুক হন, কেহ তাঁহাদের শত্রুতা করিতে পারে না,

অর্থাৎ অপরে তাঁহার শত্রুতা বা হিংসা করিলেও ভক্তের হৃদয়ে সুখের অভাব হয় না।

(১৯) যাঁহার হৃদয়ে মান-অপমান বা গৃহ-পুত্রাদির বিষয়ে চিন্তা নাই, তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে পারেন। অজ্ঞ বালক ও পরম জ্ঞানবান্ ভগবদ্‌ভক্ত উভয়েই নিশ্চিন্তভাবে ও পরমানন্দে বিচরণ করেন। সংসারে যে ব্যক্তি যত অধিক মনোনিবেশ করিবে, তাহার তত অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বালকের ন্যায় উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবানের সেবানন্দে নিমগ্ন থাকিলেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়। অবধূত বালকের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

(২০) এক সময় একটি বিবাহযোগ্যা কুমারীকে দেখিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি উক্ত কুমারীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় কুমারীর পিতা ও আত্মীয়-স্বজন কেহই গৃহে ছিলেন না। কাজেই স্বয়ং কুমারীকেই অতিথিদের সৎকার করিতে হইয়াছিল। কুমারী অতিথিগণের ভোজনের জন্য শালি-ধান্য কুটিতে উদ্যতা হইলে তাহার হাতের বালাগুলির পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে শব্দ হইতে লাগিল। ধান-ভানার বিষয় জানিলে অতিথিগণ কুমারীর পিতাকে অত্যন্ত দরিদ্র মনে করিবে বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমতী কুমারী লজ্জায় হাত হইতে ক্রমশঃ বালাগুলি খুলিয়া ফেলিল। মাত্র এক এক হাতে দুইটী করিয়া বালা রাখিল। আবার যখন ধান কুটীতে আরম্ভ করিল, তখন পূর্ব্বেরই ন্যায় বালার শব্দ হইতে লাগিল, তখন কুমারী প্রত্যেক

হাত হইতে একটী করিয়া বালা খুলিল, তখন তাহার এক একটী হাতে এক একটী বালা থাকিল।

অবধূত উক্ত কুমারীর নিকট হইতে এই শিক্ষা করিয়াছেন যে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া একের অধিক লোক একত্র বাস করে, তথায় পরস্পর বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। যে-স্থানে বহু অন্যাভিলাষী ব্যক্তির বহু অভিলাষ ও উদ্দেশ্য, তথায় সঙ্ঘের সার্থকতা নাই। সমান-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ সকলেই এক সদ্‌গুরুর অনুগত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণভজনের জন্য মিলিত বহু ব্যক্তি যদি সমভাবে ভগবানের কীর্ত্তন করেন, ভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলে একতানের কোনও ব্যাঘাত হয় না। সমান-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ভগবানের ভজনই প্রকৃত নির্জ্জনতা। নতুবা নির্জ্জনে থাকিয়াও অন্তরে বাদ-বিসম্বাদের বিষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

(২১) এক লৌহকার বাণ নির্ম্মাণ করিতেছিল। সে তাহার কার্য্যে এতটা আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার সম্মুখ দিয়া সেই দেশের রাজা বহু অনুচর ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত গমন করিতেছিলেন, কিন্তু উক্ত বাণ-নির্ম্মাণকারী তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই।

অবধূত এই বাণ-নির্ম্মাণকারীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, যিনি ভগবানে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারও বাহিরের কোন বিষয়ে অভিনিবেশ থাকে না। তিনি দেহের কার্য্যগুলিও অভ্যাসে করিয়া থাকেন। ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে—সাধুগণের সেবায়ই তাঁহার চিত্ত তন্ময় থাকে।

(২২) সর্প একাকী ভ্রমণ করে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থান নাই ; সে সর্ব্বদা সতর্ক, তাহার গতিবিধি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, সে অধিক শব্দ করে না। সর্প পরের নির্ম্মিত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া সুখে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

অবধূত সর্পের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, কাহারও অপেক্ষাযুক্ত হওয়া বা কাহারও সেবা গ্রহণ করা উচিত নহে। একাকী ভগবানের ভজন করিতে করিতে বিচরণ করা উচিত। সন্ন্যাসীর গৃহস্থের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকা উচিত নহে। যিনি ভগবানের ভজন করিবেন, তিনি সর্পের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সাধুসঙ্গে সুরক্ষিত হইয়া হরিভজন না করিলে মায়া যে-কোন-মুহূর্ত্তে আসিয়া জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারে। প্রজল্প অর্থাৎ হরিকথা ব্যতীত অন্য কথা বলা ভগবদ্-ভক্তের উচিত নহে। ভগবানের সেবক নিজের থাকিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণের ক্লেশ স্বীকার করিবেন না। জাগতিক ভারবাহী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে-সকল অট্টালিকা, সৌধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন, বা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করিয়া বৈদ্যুতিক আলো, যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন, হরিকীর্ত্তনকারিগণ ঐসকল বস্তু হরিকীর্ত্তনের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই সারগ্রাহী হইতে পারিবেন।

(২৩) উর্ণনাভ (মাকড়সা) তাহার হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র বিস্তার করিয়া উক্ত সূত্রের মধ্যে বিহার করে, পুনরায়ই উহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। অবধূত এই উর্ণনাভের নিকট

হইতে শিক্ষা করিয়াছেন যে, ভগবান্ও ঊর্ণনাভের ন্যায় তাঁহার মায়া-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া উহা আবার সংহার করিয়া থাকেন। অতএব এই মায়াময় সংসারে মত্ত না হইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

(২৮) কুমারিকা পোকা অন্য দুর্ব্বল কীটকে নিজের গৃহে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ দুর্ব্বল কীট বলবান্ কীটের চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্ব-শরীর ত্যাগ না করিয়াই ক্রমে-ক্রমে বলবান্ কীটের ন্যায় রূপ লাভ করিয়া থাকে। অবধূত ঐ কুমারিকা পোকার নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, সাধক রাগমার্গে ভগবানের নামভজন (শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ) করিতে করিতে চিদানন্দ-শরীরধারী থাকিয়া শীঘ্রই সহজে জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার দেহ ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তা'র, চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥"

অবধূত এই চব্বিশজনকে শিক্ষাগুরু করিয়া এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর নিজের দেহ হইতেও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যে-দেহের প্রতি এতটা আসক্ত হইয়া আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গল ভুলিয়া রহিয়াছি, সেই দেহকে লইয়া শৃগাল-কুক্কুরাদি পরিণামে মহোৎসব করিবে অর্থাৎ উহাই তাহাদিগের

ভোজনের সামগ্রী হইবে। অতএব দেহকে পরের সম্পত্তি জানিয়া অবধূত ভগবানের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। মায়াবদ্ধ মানুষ অতি কষ্টে ধন উপার্জ্জন করিয়া দেহের ভোগসুখের জন্য সেই ধনের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়-স্বজনের বিস্তার ও পালন করিয়া থাকে; আয়ুঃ শেষ হইলে ঐ দেহই বৃক্ষের ন্যায় অন্য দেহসৃষ্টির বীজরূপ কর্ম্মসমূহ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন গৃহস্থের অনেকগুলি স্ত্রী থাকিলে যেরূপ তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, উদর ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় দেহে আসক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

মায়াবদ্ধ প্রাণিগণ চৌরাশি-লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে; তন্মধ্যে নয়লক্ষ-বার জলজন্তু, বিশলক্ষ-বার নানা-প্রকার স্থাবরদেহ, এগারলক্ষ-বার নানাপ্রকার কৃমি-কীট, দশলক্ষ-বার নানাপ্রকার পক্ষী, ত্রিশলক্ষ-বার নানাপ্রকার পশুদেহ ও চারিলক্ষ-বার নানাপ্রকার মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া অবশেষে সাধুগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের উপদেশ-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করে। এই মনুষ্য-দেহ দেবতাদের দেহ অপেক্ষাও হরিভজনের পক্ষে অধিক উপযোগী; কারণ, দেবতাগণ স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বদা সুখভোগে মত্ত থাকায় তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য চিন্তার উদয় হয় না। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মনুষ্যদেহ থাকিতে থাকিতে একমাত্র ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্নবান্ হইবেন। বিষয়ভোগ

হইল না মনে করিয়া আক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; কারণ, অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহেও বিষয়ভোগ পাওয়া যাইতে পারিবে। সমস্ত জন্মেই ভোগ্য দেহ-মনের তৃপ্তিকর বস্তু (আত্মীয়াকারেই হউক বা দ্রব্যাকারেই হউক) অর্থাৎ 'বিষয়' পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র মনুষ্য-জন্ম-ব্যতীত আর অন্য কোন জন্মে সদ্‌গুরুদেব ও কৃষ্ণের সেবা লাভ হয় না।

অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু

অবন্তীনগরীতে (মালবদেশে) এক ব্রাহ্মণ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেবতা, জ্ঞাতি, অতিথি বা কাহাকেও তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে এক কপর্দ্দকও প্রদান করিতেন না। তাঁহার এইরূপ যক্ষতুল্য কৃপণ স্বভাব দেখিয়া কি পুত্র, কি স্ত্রী, কি কন্যা, কি বন্ধু-বান্ধব, কি দেবতা কেহই তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। দেবতাগণ রুষ্ট হওয়ায় কৃপণ-ব্রাহ্মণের অর্থ নানাভাবে বিনষ্ট হইতে লাগিল। দস্যু, গৃহদাহ প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক, রাজা ও লোকের উৎপীড়নে কালপ্রভাবে সমস্ত অর্থই বিনষ্ট হইল। তখন আত্মীয় স্বজন ঐ ব্রাহ্মণকে আরও উপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাদের ব্যবহারে

মর্ম্মাহত হইয়া ব্রাহ্মণের বিরাগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন অনুতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি অর্থের জন্য এত চেষ্টা করিয়াও ধর্ম্ম বা কাম কোনটাই লাভ করিতে পারি নাই, নিজের শরীরকেও বৃথা কষ্ট প্রদান করিয়াছি। অর্থের উপার্জ্জন ও বর্দ্ধনে মহা-প্রয়াস, ব্যয়ে ত্রাস, রক্ষণ-উপভোগে চিন্তা এবং বিনাশে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা-বাক্য, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, গর্ব্ব, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য-বিষয়ক নানপ্রকার পাপ কার্য্য 'অর্থ' নামক অনর্থ হইতে উদিত হয়। ভ্রাতা, স্ত্রী, পিতা, বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়ব্যক্তিগণও অতি সামান্য পরিমাণ অর্থের জন্য শত্রু হইয়া পড়ে। এই অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যে-ব্যক্তি অর্থের অনর্থে পতিত হয় এবং ভগবানের ভজন পরিত্যাগ করে, তাহার মত মূর্খ আর কে আছে? যাঁহার অনুগ্রহে আমার এই দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সেই ভগবান্ হরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। খট্বাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকাল সাধন করিয়াই বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবানের কৃপা হইলে আমার পক্ষেও অল্পক্ষণের মধ্যে মঙ্গল-লাভ অসম্ভব নহে।"

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অবন্তীনগরীর ব্রাহ্মণ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সংসারের ভোগ বা সংসারের ত্যাগ এই উভয় কার্য্যে জগতের লোকের দেহ, বাক্য ও মন নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ উভয়বিধ কার্য্য

হইতে দেহ, মন ও বাক্যকে তুলিয়া আনিয়া ভগবানের সেবার কার্য্যে অর্থাৎ ভগবানের নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে নিয়োগ করাই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ। জগতের লোক-সমূহ জগতের সেবায় দেহ, বাক্য ও মন নিয়োগ করে। সুতরাং ভগবানের সেবায় কাহাকেও ঐসকল নিযুক্ত করিতে দেখিলে তাহারা ঐরূপ ব্যক্তিকে তাহাদের দল-ছাড়া মনে করিয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অবন্তীনগরীর মলিনবাস বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া সামাজিক লোকসকল নানাপ্রকার কুবাক্য প্রয়োগ ও নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক ত্রিদণ্ড যে নারায়ণ-স্বরূপ,



তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে এক খণ্ড বংশযষ্টি-মাত্র মনে করিয়া উহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা জপের মালা, বস্ত্র, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া গেল।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু তাঁহার ভিক্ষার অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া নদীর তীরে তাহা গ্রহণ করিতে বসিলে সামাজিকগণের ইঙ্গিতে কতিপয় বালক ত্রিদণ্ডীর ভগবৎ-প্রসাদের উপর থু-থু, বালি, ছাই, মাটী প্রভৃতি নিক্ষেপ, ত্রিদণ্ডীর গাত্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ, নানাপ্রকার তিরস্কার ও নির্য্যাতন করিতে লাগিল। ভিক্ষু ইহাতেও কিছু না বলায় উহারা নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাঁহাকে কথা বলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু এই সকল উৎপীড়নে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া উহাদিগকে দৈব-দণ্ড ও ভগবানের কৃপা-জ্ঞানে বরণ করিলেন। নরাধম-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুকে তাঁহার স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবার জন্য নানাপ্রকার নিন্দা, কুৎসা, কটূক্তি করিলেও তিনি সাত্ত্বিক-ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া এই গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

"মানুষ, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল—কেহই আমার সুখ-দুঃখের কারণ নহে। যাহা দ্বারা এই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মনই একমাত্র এই সুখ-দুঃখের কারণ। এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী ও যোগিগণের নিকটও ভয়ঙ্কর। অতএব **যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকেন।** এই মনরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া অন্যের সহিত বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যে-ব্যক্তি রিপুগণকে মিত্ররূপে বরণ করে, সে অতিশয় মূর্খ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবায় রতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই

মনের নিগ্রহ হইতে পারে না। অতএব আমি পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের সেবিত এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবার দ্বারা অনন্ত অপার অজ্ঞান-সাগর উত্তীর্ণ হইব।"

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু এইরূপ বিচার করিয়া অক্লান্তভাবে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর এই চরিত্র হইতে জীবমাত্রেরই শিক্ষার বিষয় আছে। পৃথিবীর বহির্ম্মুখ-লোক বা গণমতের নিকট যাঁহারা অধিক প্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহারাই ভোগী কর্ম্মী বা প্রতিষ্ঠা-কামী। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—'গৌর-ভজা, লোক-রক্ষা একত্রে নিষ্ফল।' বহির্ম্মুখ-লোক-ভজন করিতে গেলে ভগবানের ভজন হয় না। ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিলেই বহির্ম্মুখ-লোক নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও নির্য্যাতনাদি করিয়া ভজনকারীকে সত্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে। আবার যখনই ঐরূপ নির্য্যাতন আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে হরিভজনের সূচনা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ম্মুখ জীব আব্রহ্ম-স্তম্ভ ভগবদ্ভজনকারীর শত্রু হইয়া দণ্ডায়মান হয়। দেবতাগণ মনে করেন, ভক্ত তাঁহাদের পদবী ও লোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠলোকে আরোহণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও হরিভজনকারীকে প্রবলভাবে বাধা দিবার জন্য তাঁহার নিকট নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করেন। কেবল যে অসুরগণ হরিভজন-কারীর বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা নহে, দেবতাগণও ভগবদ্ভক্তের বিঘ্ন-উৎপাদনে বদ্ধপরিকর হন। এই সমস্ত বিঘ্ন পদ-দলিত

করিয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত পথের অনুসরণ করিতে হইবে। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু সেই পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। তিনি অপরকে দোষী না করিয়া নিজের মনকে শাসন করিয়াছেন এবং সেই আত্ম-মনঃ-শিক্ষাচ্ছলে সমগ্র জগৎকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন যে, পৃথিবীর বহির্ম্মুখ লোকের শত-শত উৎপীড়ন, নির্য্যাতন, অবিচার, নিন্দা, কুৎসা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রীমুকুন্দের সেবায় আত্ম-নিয়োগই আত্মার মঙ্গল-জনক কার্য্য। এই বহির্ম্মুখ-জগতের নির্য্যাতনাদি হরিভজনের প্রতিকূল নহে,—উহা সম্পূর্ণ অনুকূল।

ভক্ত ব্যাধ

একদিন শ্রীনারদ গোস্বামী প্রয়াগ-তীর্থে যাত্রা করিলেন। তিনি বন-পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন,—ভূমিতে একটি হরিণ বাণবিদ্ধ হইয়া ধড়্ফড়্ করিতেছে; আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি শূকরও ঐরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে। নারদ আরও কিছুদূর চলিতে চলিতে একটি খরগোসকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ঐসকল প্রাণীর ঐরূপ যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া নারদের

হৃদয়ে বড়ই কষ্ট হইল। কে এইসকল প্রাণীকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূরে গিয়া দেখিতে পাইলেন,—এক ব্যাধ একটি বৃক্ষের আড়ালে পশু মারিবার ইচ্ছায় বাণ জুড়িয়া ওত পাতিয়া রহিয়াছে। ব্যাধটি দেখিতে মহা-ভয়ঙ্কর, শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, তাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সে যেন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যমদূত।

নারদ ব্যাধকে দেখিয়া আপন-পথ ছাড়িয়া ব্যাধের নিকট চলিলেন। নারদকে দেখিয়া পশুগুলি সব পলাইয়া গেল। ইহাতে ব্যাধের ক্রোধের সীমা থাকিল না; কেবল নারদের অদ্ভুত প্রভাবে ব্যাধ তাঁহাকে মুখে গালি দিল না; কিন্তু অন্তরে ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল ও নারদকে বলিল,—"গোসাঞি! তোমার চলিবার পথ ছাড়িয়া তুমি কেন এদিকে আসিলে? তোমাকে দেখিয়া আমার লক্ষ্য পশুগুলি পলাইয়া গেল।"

নারদ বলিলেন,—"আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভঞ্জন করিবার জন্য তোমার নিকট আসিলাম। পথে যে কতকগুলি অর্দ্ধমৃত পশু দেখিতে পাইলাম, মনে হয়, সেগুলি তোমার। তুমি পশুগুলিকে যদি হত্যা কর, তবে কেন অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখ; সম্পূর্ণভাবে উহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেই ত' তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

ব্যাধ কহিল,—"গোসাঞি! আমার নাম—মৃগারি! আমি পিতার শিক্ষা-মতে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। অর্দ্ধমৃত হইয়া পশুগুলি যদি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, তবেই আমি অধিক আনন্দ

পাই ; একেবারে মারিয়া ফেলিলে আমি সেইরূপ সুখ উপভোগ করিতে পারি না।”

নারদ কহিলেন,—“ব্যাধ! তোমার নিকট আমি একটি জিনিষ ভিক্ষা চাই।”

ব্যাধ—বেশ, তুমি যদি পশু চাও, আমি তোমাকে তাহাই দিব। যদি হরিণের ছাল চাও, তবে আমার ঘরে চল। হরিণের ছাল, বাঘের ছাল, যাহা কিছু চাও, সব তোমাকে দিব।

নারদ—আমি এই সকল কিছুই চাহি না। তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা—তুমি আগামী কল্য হইতে যে-সকল পশু মারিবে, তাহা একেবারেই মারিয়া ফেলিবে, অর্দ্ধমৃত করিতে পারিবে না।

ব্যাধ—তুমি এই ভিক্ষা চাহিতেছ! ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? পশুকে অর্দ্ধমৃত-অবস্থায় রাখিলে কি হয়?

নারদ—ইহাতে জীব কষ্ট পায়। তুমি যেরূপ জীবকে দুঃখ দিতেছ, তোমাকেও এইরূপ অর্দ্ধমৃত হইয়া কষ্ট পাইতে হইবে। তুমি যে জীবকে হত্যা কর, ইহা খুব পাপ ; কিন্তু তুমি যে উহা-দিগকে কষ্ট দিয়া বধ কর, সেই পাপের সীমা নাই। তুমি পশু-দিগকে যেরূপ কষ্ট দিয়া মারিতেছ, পশুরাও তোমার পর-পর জন্মে তোমাকে সেরূপ কষ্ট দিয়াই মারিবে। যে যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাকেও তাহার হাতে সেরূপ ব্যবহার পাইতে হয়।

নারদের এই সকল কথা শুনিয়া ব্যাধের মনে ভয় হইল। সে প্রত্যহ কত কত পশুকে এইরূপ অর্দ্ধমৃত করিয়া কষ্ট প্রদান

করিতেছে, ইহার ফল-ভোগ করিবার জন্য তাহাকে কত কত জন্মই-না গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহাতে কত কষ্টই-না পাইতে হইবে তাহা ভাবিয়া ব্যাধ অস্থির হইল। তখন ব্যাধ পুনরায় নারদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গোসাঞি! আমি বাল্যকাল হইতেই এই কর্ম্ম করিতেছি। কেমন করিয়া আমার ন্যায় পাপী উদ্ধার পাইবে? কি উপায়ে আমি এই পাপ হইতে রক্ষা পাইব? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।"

নারদ কহিলেন,—"যদি তুমি আমার কথা-মত কাজ কর, তবে আমি তোমাকে এই পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।"

ব্যাধ—তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।

নারদ—সকলের আগে তোমার ধনুকটি ভাঙ্গ, তারপর অন্য কথা বলিব।

ব্যাধ—ধনুক ভাঙ্গিলে আমি কি করিয়া বাঁচিব?

নারদ—আমি রোজ তোমার অন্নের ব্যবস্থা করিব।

নারদের এই কথায় ব্যাধ তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক ভাঙ্গিয়া নারদের শ্রীচরণে পতিত হইল। তখন নারদ ব্যাধকে উঠাইয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন,—"ব্যাধ! তুমি ঘরে গিয়া তোমার পাপার্জ্জিত সমস্ত ধন ব্রাহ্মণকে বিতরণ কর এবং তুমি ও তোমার পত্নী এক একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ পরিত্যাগ কর। নদীর তীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া উহার সম্মুখে একটি তুলসীর বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুলসী রোপণ কর। তুলসী-পরিক্রমা ও তুলসীর সেবা করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন

কর। তুমি আহারের জন্য ভাবিও না; আমি তোমার জন্য যথেষ্ট অন্ন পাঠাইয়া দিব; তোমরা দুইজনে যত ইচ্ছা ভোজন করিও।"



ইহার পর নারদ পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধমৃত হরিণ, শূকর ও খরগোসকে সুস্থ করিলেন; ইহা দেখিয়া ব্যাধ আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও শ্রীগুরুদেবের চরণে ক্রমশঃই তাহার সুদৃঢ় ভক্তি উপস্থিত হইল। নারদ চলিয়া গেলে ব্যাধ গৃহে আসিয়া নারদের উপদেশমতই সমস্ত করিল। গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে, দুর্দ্দান্ত ব্যাধ গুরুদেবের কৃপায় বৈষ্ণব হইয়াছে। তখন গ্রামের সমস্ত লোক ব্যাধকে অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। এক একদিন দশ বিশজন লোক এইরূপ নানাপ্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিত; কিন্তু ব্যাধ তাহার সহধর্ম্মিণী ও নিজের জন্য যতটুকু দরকার, সেই পরিমাণ-মাত্র গ্রহণ করিত, বেশী কিছু গ্রহণ করিত না।

ইহার কিছুদিন পর একদিন নারদ পর্ব্বত-মুনিকে লইয়া সেই ব্যাধের নিকট যাত্রা করিলেন। ব্যাধ দূর হইতেই শ্রীগুরুদেবকে দেখিয়া আস্তে-ব্যস্তে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে করিতে চলিল।

দণ্ডবৎ করিবার স্থানে পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বস্ত্রদ্বারা স্থান ঝাড়িয়া দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। নারদ ব্যাধের চিত্তে এইরূপ অহিংসার ভাব দেখিতে পাইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—"ব্যাধ! তোমার এইরূপ পরিবর্ত্তন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীহরির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা কখনও অপরকে কষ্ট প্রদান করেন না। হরিভক্তের স্বভাবেই আনুষঙ্গিকভাবে অহিংসাধর্ম্ম বিরাজিত থাকে।

ব্যাধ শ্রীগুরুদেব ও পর্ব্বত মুনির জন্য দুইটী কুশাসন আনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে বসিতে দিল, জল আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের পাদ ধৌত করিল এবং সেই পদধৌত-জল পতি-পত্নী উভয়ে শিরে গ্রহণ করিল। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্যাধের সাত্ত্বিক-ভাব শরীরে প্রকাশিত হইল। ব্যাধ বাহু তুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পর্ব্বত-মুনি ব্যাধের ঐরূপ প্রেম দেখিয়া নারদকে বলিলেন,—"আপনি 'স্পর্শমণি', তাই আপনার স্পর্শে লৌহও কাঞ্চন হইয়াছে।"

সাধু সঙ্গের ফলে অতি হিংস্র-স্বভাব ব্যক্তিও কিরূপ মঙ্গল-লাভ করিতে পারে, ভক্ত ব্যাধের উদাহরণে তাহার শিক্ষা রহিয়াছে। মহাভাগবতগণই প্রকৃত 'স্পর্শমণি' তাঁহাদের চরণে কোন অপরাধ না করিলে এবং তাঁহাদের উপদেশ নিষ্কপটে পালন করিলে অতিশয় পাপী, ব্যাধের ন্যায় পরহিংসক ব্যক্তিও জীবনের পরম ও চরম প্রয়োজন হরিভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। এখানে ব্যাধ-পত্নীর আদর্শেও শিখিবার বিষয় আছে। কোন

কোন সময় পতির চিত্তের পরিবর্ত্তন হইলেও ভোগের অভাব হইবে আশঙ্কা করিয়া পত্নী পতির; কিংবা পত্নীর চিত্তের পরিবর্ত্তন হইলেও ভোগ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে—এই ভয়ে পতি পত্নীর হরিভজনের আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। বস্তুতঃ যে পত্নী পতির হরিভজনের আদর্শের অনুসরণ করে, শতক্লেশ স্বীকার করিয়াও, ভোগ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও পতির হরিভজনের সর্ব্বতোভাবে সহায়কারিণী হয়, সেই সহধর্ম্মিণী বা সতী-পদবাচ্যা; আর যে পতি পত্নীকে হরিভজনে নিযুক্ত না করে, সে পতি 'পতি'-পদবাচ্য নহে। সে পত্নীর হিংসাকারী নৃশংস ব্যক্তি, সে হিংস্র পশু হইতেও অধিক প্রাণঘাতক।



দুর্নীতি, সুনীতি ও ভক্তিনীতি

শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন প্রধান প্রাচীন আচার্য্য—শ্রীরামানুজ। তিনি ১০১৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকটে 'মহাভূত পুরী' বা পেরম্বেদুর-নগরে আবির্ভূত হন। তাঁহারও আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে উক্ত মত-প্রচারক যে-সকল প্রাচীন সিদ্ধ (মুক্ত) ভগবৎ-পার্ষদ মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দ্রাবিড়ী ভাষায় 'আল্‌বর' বলা হইত। এই আল্‌বরগণ—কোন মতে

দশজন, কোন মতে শ্রীরামানুজকে গণনা করিয়া বারজন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল আল্‌বরের মধ্যে এক মহাত্মা 'তিরুমঙ্গই আল্‌বর'-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে ইনি আবির্ভূত হন।

ইনি যুব-বয়স হইতেই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভগবানের ভজন করিতেন। 'নারায়ণের সেবার জন্যই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ঐসকল বস্তুর দ্বারা যথাযোগ্যভাবে নারায়ণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। নারায়ণের সেবায় যথাযোগ্য নিয়োগ ব্যতীত কোন বস্তু বা প্রাণীরই সার্থকতা নাই,'—ইহাই তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্ত ছিল। বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণকালে অসাধারণ বিভূতিসম্পন্ন চারিজন ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন,—তাঁহার প্রথম শিষ্যের নাম—'তোড়াবড়ক্কুন্‌' বা তর্কচূড়ামণি অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন না; দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—'তাড়ডুয়ান্‌' বা দ্বারোন্মোচক অর্থাৎ তিনি ফুৎকার দিবা-মাত্রেই সকল রকমের তালা খুলিয়া ফেলিতে পারিতেন; তৃতীয় শিষ্যের নাম—'নেড়েলাই মেরিপ্পান্‌' বা ছায়াগ্রহ অর্থাৎ ইনি পদদ্বারা যখনই যে-কোন ব্যক্তির ছায়া স্পর্শ করিতেন, অমনিই তাহার গতিরোধ হইয়া যাইত; চতুর্থ শিষ্যের নাম—'নীল্‌মেল্‌ নড়প্পান্‌' বা জলোপরিচর অর্থাৎ ইনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিতে পারিতেন। এই চারিজন শিষ্যের সহিত তিরুমঙ্গই নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া অতি প্রাচীন ও তদানীন্তন জীর্ণ চতুর্ভুজ শেষ-শয়ন শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সুপ্রসিদ্ধ মন্দির তৎকালে

পশু-পক্ষীর আবাস-স্থান এবং চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুর ক্রীড়াভূমি বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন একজন সেবক দিবাভাগে মন্দিরে কিছুকাল থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মাত্র একবার কিঞ্চিৎ ফুল ও জল প্রদান করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব প্রাণভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ইহা দেখিয়া তিরুমঙ্গইর হৃদয়ে শ্রীরঙ্গনাথের একটি বৃহৎ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি অতঃপর শিষ্যগণের সহিত দেশে-দেশে ধনবান্ ব্যক্তিগণের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষা-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ধনি-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'ভণ্ড', 'লোভী', 'চোর' প্রভৃতি বলিয়া বিতাড়িত করিল,—কেহই এক কপর্দ্দকও দান করিল না।

ইহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গনাথের সেবা করিবার জন্য আরও অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চারিজন শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে বৎসগণ! তোমারা দেখিলে ত' ধন-মদান্ধ ব্যক্তিগণের কিরূপ চিত্তবৃত্তি! লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ ইহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, উহা দ্বারাই ইহাদের নারায়ণের সেবা করা উচিত। কিন্তু ইহারা সেই গচ্ছিত সম্পত্তিকে কিরূপভাবে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদিগকে ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বলিয়া মনে করিতেছে! ইহারা উচ্চ প্রাসাদের দুগ্ধ-ফেননিভ-শয্যায় ভোগময় জীবন যাপন করিয়া শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনের প্রতি কিরূপ বিমুখ হইয়াছে! শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি ভগ্নমন্দিরে জঙ্গলের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন,—হায়!

সেইদিকে ইহাদের দৃক্‌পাতও নাই! ধনবন্ত গৃহস্থগণের বিষ্ণুর অর্চ্চনই কর্ত্তব্য—নতুবা, তাহাদের নরকগমন অবশ্যম্ভাবি। অতএব যে-কোন প্রকারেই হউক, এই সকল ধনমদমত্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গল করিতে হইবে।"

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার চারিজন শিষ্যের যোগ-বিভূতি-সমূহকে বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগের প্রকৃত সদ্‌ব্যবহার ও বিষয়িগণের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে-শিষ্যটি তার্কিকচূড়ামণি, তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি ধনিগণকে তর্কজালে আবদ্ধ করিতে বলিলেন এবং সেই অবসরে দ্বারোন্মোচক শিষ্যের দ্বারা ধনিগণের ধনকোষের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া যথেচ্ছভাবে ধনরত্ন সংগ্রহ করাইলেন। তাঁহার ছায়াগ্রহ শিষ্যের দ্বারা তিনি ধনশালী পথিকদিগের গতি রোধ-পূর্ব্বক তাহাদিগের যাবতীয় ধন লুণ্ঠন এবং জলোপরিচর শিষ্যের দ্বারা পরিখা-বেষ্টিত রাজপুরী-সমূহ হইতে বহু ধন সংগ্রহ করাইলেন। বলিতে কি, তিনি যেন এক বৃহৎ দস্যুদলের অধিনায়ক হইয়া রঙ্গনাথের সেবার জন্য অসংখ্য রত্ন-রাশি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর তিরুমঙ্গই বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে আনাইয়া মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সহস্র-সহস্র শিল্পীর চারিবৎসরকাল পরিশ্রমের ফলে প্রথম বহিঃপুরী, দুই বৎসরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, আট বৎসরে চতুর্থ, বার বৎসরে পঞ্চম ও আঠার বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরীর কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। সমগ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সর্ববশুদ্ধ ষাট বৎসর লাগিল। তিরুমঙ্গই সেই

সময় আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। অন্তঃপুরী নির্ম্মিত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজগণ তিরুমঙ্গইকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। কেহ তিরুমঙ্গইর ঐশ্বর্য্য-দর্শনে, কেহ বা ভয়ে সেই মহাপুরুষের সেবার সহায়তা করিয়া সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র-ভোগ-চেষ্টা না থাকায় তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াও ভগবানেরই সেবা করিয়াছিলেন,—স্বভোগার্থ ঐ সকল অর্থের কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকার বেষ্টিত মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল; তিনি সকলকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন। তিরুমঙ্গইর হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই,—এমন সময় যে-সকল দস্যু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠিত অর্থ দাবী করিল। তিরুমঙ্গই তখন তাঁহার জলোপরিচর শিষ্যের কর্ণে কয়েকটি সদুপদেশ দিয়া দিলেন। শ্রীরঙ্গমের মন্দির-নির্ম্মাণ-কালে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিবার জন্য যে একটি বৃহৎ পোত ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই পোতটিকে আনয়ন করিয়া জলোপরিচর-শিষ্য ঐ দস্যুগণকে উহাতে আরোহণ করাইলেন ও জানাইলেন,—যে-স্থানে লুণ্ঠিত গুপ্তধন প্রোথিত রহিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন। সেই পোতখানিকে বর্ষাকালে গভীর-তোয়া কাবেরী নদীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া জলোপরিচর-শিষ্যটি দস্যুগণের সহিত উহাকে জলমগ্ন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং জলের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিজ-গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দস্যুগণ তিরুমঙ্গইএর

জীবন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। জলপরিচয় শিষ্যটি প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহাত্মা তিরুমঙ্গই বলিলেন,—"পাপ-বিনাশিনী ও বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী কাবেরীর জলে দস্যুগণ সমাধি লাভ করায় তাহাদের আত্মা নিশ্চয়ই শ্রীরঙ্গনাথের অঙ্কে গৃহীত হইয়াছে, তুমি চিন্তিত হইও না,—দস্যুবৃত্তির ও বৈষ্ণব-হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তুমি তাহাদিগকে যে বৈকুণ্ঠ-গমনের সুযোগ প্রদান করিয়াছ, তাহা কি তাহাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ হয় নাই? আমরা ভগবানের সেবার জন্যই তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলাম,— **কেহ ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের জন্য ঐরূপ কার্য্যের অনুকরণ করিলে উহা নরহত্যা-মূলক ভীষণ পাপ ও নরকের সেতু বলিয়া গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই।**" কাবেরী-নদীর উত্তরভাগে ঐ দস্যুগণের বিনাশ হইয়াছিল বলিয়া কাবেরী-নদীর ঐ অংশ এখনও 'কোলিরন্' (**Coliron**) অর্থাৎ 'হত্যাস্থান' নামে পরিচিত।

তিরুমঙ্গই আলোয়ারের এই আদর্শ হইতে শিক্ষার বিষয় এই যে, জাগতিক সুনীতি বা দুর্নীতি হইতে ভক্তিনীতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবা অনেক ঊর্দ্ধে বা অতুলনীয়। তথা-কথিত সুনীতি বা দুর্নীতি যদি শ্রীহরির প্রীতি সাধন না করে, তবে উভয়ই অভক্তি। পাপ ও পুণ্য, উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির প্রীতি সাধন করিতে হইবে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু-কৃত ভক্তিসন্দর্ভ ১৪৮ অনুচ্ছেদে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শাস্ত্র-বাক্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার বাক্য, যথা—

"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা; আর, হে অচ্যুত! যে-ব্যক্তি তোমার ভক্ত নহে, সে সর্ব্ববিধ পাপেরই আচরণকারী। হে হরি! তোমার অভক্তগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়াই গণ্য হয় এবং তোমার অভক্ত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের আচরণকারী হইলেও সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে। কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। পদ্মপুরাণেও ভগবানের বাক্য, যথা—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।"

অর্থাৎ আমার নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ-কর্ম্মও ধর্ম্মরূপেই গণ্য হয়, আর আমাকে অনাদর-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপকর্ম্মরূপেই পরিণত হয়।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই আখ্যায়িকাটি বর্ণন করিয়া অনেক সময় জানাইতেন যে, প্রকৃত হরিভক্তগণের চরিত্র আধ্যক্ষিকতার (প্রত্যক্ষ জ্ঞানের) ক্ষুদ্র গণ্ডিতে মাপা যায় না; কারণ, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সাধিত হয়। ভক্তিতে প্রত্যেক বস্তুর সুসমন্বয়

আছে। ওস্তাদ্ সাপুড়ের ন্যায় বিষধর সর্পবৎ ক্রূর ও খলচিত্ত ব্যক্তিগণকে লইয়াও মহাভাগবত-বৈষ্ণব স্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন; কিন্তু অপরে তাঁহার অনুকরণ করিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণ তাঁহাদের নিজ-ভজনের সহায়তা ও জীবের সুকৃতি উৎপাদনের জন্য অনেক অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকেও আপাত-ভাবে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন। যখম সেই সকল ব্যক্তি আচার্য্য বা গুরুদেবের সহিত বণিগ্‌বৃত্তি আরম্ভ করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যদুবংশের ধ্বংস, তিরুমঙ্গই আলোয়ার কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে দস্যুগণকে কাবেরী নদীর জলে লইয়া গিয়া হত্যা প্রভৃতি আদর্শ এই সত্যই প্রচার করে।



ঢঙ্গ বিপ্র

একদিন কোন ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে একজন সর্পক্রীড়ক (সাপুড়ে) নৃত্য করিতেছিলেন। দৈবাৎ সেই স্থানে ঠাকুর হরিদাস * আগমন করিয়া ঐ সর্পক্রীড়কের শরীরে বাসুকীর আবেশ হওয়ায় তিনি বাসুকীর ভাবেই নৃত্য করিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গিগণ করুণ-রাগে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন-লীলা গান করিতেছিলেন। উক্ত লীলা-গান শ্রবণ করিয়া মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সানন্দে হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাসের অলৌকিক-ভাব-মুদ্রা দর্শন করিয়া ঐ সর্পক্রীড়ক সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে অবস্থান করিলেন। ঠাকুর হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত অশ্রু, পুলক ও কম্পাদি প্রকাশ পাইতে থাকিল। কখনও বা ঠাকুর অত্যন্ত আর্ত্তিভরে প্রেম-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর হরিদাস বাহ্য-দশা লাভ করিলে পুনরায় ঐ সর্পক্রীড়ক নৃত্য করিতে থাকিলেন। হরিদাস ঠাকুরের অকৃত্রিম প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া সকলেই সেই মহাভাগবতশ্রেষ্ঠের শ্রীচরণ-

---

* শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হরিনামাচার্য্যরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম পার্ষদ-ভক্ত ছিলেন।

ধূলি শিরে গ্রহণ ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। সেই স্থানে ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন এক ধূর্ত্ত ও কপট ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে মনে মনে বিচার করিল—"আমি ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আর হরিদাস অহিন্দুকুলে জাত একটা ভিক্ষুক-মাত্র। আজকাল মূর্খ ও বর্ব্বর ব্যক্তিরও নৃত্য দর্শন করিয়া যখন লোকে তাহাকে ভক্তি করে, তখন আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ভাবুকতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধিক সম্মান লাভ করিবে,—এই ভাবিয়া মৎসর বশীভূত ব্যক্তি ঢঙ্গ-ব্রাহ্মণ কৃত্রিম ভাবকেলি দেখাইয়া ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। এই ধূর্ত্ত ব্যক্তি ঠাকুর হরিদাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই ঐরূপ কৃত্রিম-ভাবকেলি দেখাইতেছে —ইহা পূর্ব্বোক্ত সর্পক্রীড়কও বুঝিতে পারিয়া উক্ত ভণ্ডের গাত্রে ভীষণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তাব্র বেত্রাঘাতের ফলে ঐ অনুকরণকারী প্রাকৃত-সহজিয়ার * নিজ-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং সে 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া পলায়ন করিল।

তখন ঐ সর্পক্রীড়ক নিশ্চিন্ত-মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সকলে যোড়হস্তে ঐ সর্পক্রীড়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যখন ঠাকুর হরিদাস নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সর্পক্রীড়ক কেনই বা একপার্শ্বে সসম্ভ্রমে যুক্তকরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আর যখন ব্রাহ্মণটি সেইরূপভাবেই নৃত্য করিল, তখনই বা সর্পক্রীড়ক

---

* প্রাকৃত-সহজিয়া—যাহারা মুক্ত-সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া জনগণমনো-মোহনকর কৃত্রিম অস্থায়ী ভাবমুদ্রাদি প্রদর্শন করে, অথচ উহাদের হৃদয়ে কামাদি রিপু ও লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।

মহাশয় কেন ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলেন। বৈষ্ণব-নাগ বাসুকীর আবেশে আবিষ্ট হইয়া সর্পক্রীড়ক তদুত্তরে বলিলেন যে, উক্ত ঢঙ্গ (ভণ্ড) ব্রাহ্মণটি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি মৎসর-বশতঃ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে ও লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-লাভের নিমিত্ত ঐরূপ কৃত্রিম-ভাবকেলি দেখাইয়াছিল। ঠাকুর হরিদাসের নৃত্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন এবং তাঁহার নৃত্য দর্শন করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও জীবের মায়া-বন্ধনের মোচন হয়। ভক্তের অনুকরণকারী লৌকিক যশঃ-সম্মান-লোলুপ কপট সহজিয়াগণের লোকরঞ্জনের জন্য যে ভাবুকতার অভিনয়, তাহা কেবল ভণ্ডামি-মাত্র।

"হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি' করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে॥
বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত আঃ ১৬।২২৭-২২৯



ভক্তবিদ্বেষের ফল

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তিকালের কথা। পদ্মাবতী নদীর তীরে খেতুরী গ্রামে উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্রভূমির রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী ছিল। কৃষ্ণানন্দের পুত্ররূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দত্ত। পুরুষোত্তমের পুত্র—সন্তোষ। সন্তোষ সর্ব্ব-শাস্ত্রে নিপুণ ও প্রজা-পালনে সুদক্ষ ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম বিপুল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন দেখিয়া সন্তোষও শ্রীল নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর নরোত্তমের পরম বন্ধু ছিলেন—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। উভয়েই মহাভাগবত। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম খেতুরী গ্রামে বাস করিয়া হরিভজন করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অনেক সময় ঠাকুর নরোত্তমের নিকট থাকিয়া একসঙ্গে ভগবদ্ভজন করিতেন। লোকে বলিত,—দুইজন যেন 'হরিহরাত্মা'।

শারদীয়া দুর্গা-পূজার কএকদিন পূর্ব্বে একদিন ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া পদ্মাবতী-নদীতে স্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। এমন সময়, তাঁহারা পথে দেখিতে পাইলেন, দুইজন অতীব সুন্দর-দর্শন ব্রাহ্মণ-কুমার কতিপয়

অনুচরের সহিত কতকগুলি ছাগ, মেষ ও মহিষ লইয়া উৎসাহভরে পদ্মাবতী-নদীর দিকে যাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীনরোত্তম তাঁহার বন্ধু শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—"এই দুইটি ব্রাহ্মণ-কুমারকে খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হইতেছে। ইঁহারা যদি হরিভজন করিতেন, তবে ইঁহাদের উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপ—এ সমস্তই সার্থক হইত।"

অপরিচিত ব্রাহ্মণ-কুমারদ্বয়ের নিকট অযাচিতভাবে কি করিয়া বা এই সকল কথা বলা যায়? বিশেষতঃ উঁহারা ছাগ, মেষ, মহিষাদি লইয়া যেরূপভাবে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে ঘোর শক্তি-উপাসকের বংশধর, ইহাই মনে হয়। এমতাবস্থায় তাঁহাদিগের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বলিলে তাঁহারা হয় ত' অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিবেন, অথচ তাঁহাদের কি করিয়া মঙ্গল বিধান করা যায়, সে চিন্তা করিয়া কবিরাজ মহাশয় একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ঠাকুর নরোত্তমের সহিত নানাপ্রকার শাস্ত্র-প্রসঙ্গ আলাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ-কুমারদ্বয় ঠাকুর-মহাশয় ও কবিরাজ-মহাশয়ের সমস্ত আলাপই শুনিতে পাইলেন। ঐ সকল সুযুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত কথা শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-সকল সন্দেহ ছিল, সমস্তই চলিয়া গেল। তাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত নির্ম্মল হইল। তখন ঐ দুই ব্রাহ্মণ-কুমার পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"লোকের মুখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ মহাশয়ের মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছিলাম। এই দুই জনের শাস্ত্র-জ্ঞান দেখিয়া মনে হয়,

ইঁহারা সেই দুই মহাত্মা হইবেন। আজ আমাদের বড়ই সুপ্রভাত যে, এই দুই মহাপুরুষকে সাক্ষাদ্‌ভাবে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু আমারের সঙ্গে শক্তিপূজার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি রহিয়াছে। ঐ সকল লইয়া কি করিয়াই বা এই দুই পরম বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হই?"

ব্রাহ্মণ-কুমারদ্বয় তখন ছাগ, মেষ, মহিষগুলিকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত ও সঙ্কুচিতভাবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনরোত্তম দুইজন ব্রাহ্মণ-পুত্রকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ-যুবকদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি বলিলেন,—"আমার নাম হরিরাম ভট্টাচার্য্য। আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, আমাদের পিতার নাম—শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্য।" তখন ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এই সকল ছাগ, মহিষ লইয়া কোথায় যাইতেছ? তোমরা কি এইগুলিকে হত্যা করিবে?" তখন হরিরাম বলিলেন,—"আমার পিতা-ঠাকুর প্রতিবৎসরই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্গা-পূজা করিয়া থাকেন। জীব-হিংসায় তাঁহার রুচি নাই, তবে দুর্গাদেবীর নিকট ছাগ, মহিষাদি বলি দিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়—এই ধর্ম্মপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঐ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারই আজ্ঞায় আমরা হাট হইতে এই সকল পূজার উপকরণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছি। শ্রীবলরাম-কবিরাজ আমাদের পরিচিত, তিনি একজন মহা-বৈষ্ণব। আমরা তাঁহার নিকট হইতে

বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করি এবং জীবহিংসা যে মহা-পাপ, তাহাও জানি। আপনারা দুইজন যে-সকল শাস্ত্র-কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় সন্দেহ দূর হইয়াছে। আপনারা এই নরাধমদ্বয়কে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনাদের 'পতিতপাবন'-নাম সার্থক করুন। আমরা নিজের ও পরের প্রতি আর হিংসা করিব না,—এই ছাগ, মহিষগুলিকে আমরা এখানেই ছাড়িয়া দিতেছি, উহাদিগকে দেবীর সম্মুখে বলি দিবার জন্য পিতার নিকট আর লইয়া যাইব না। আপনাদের কৃপায় আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে।"

এই বলিয়া হরিরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার সঙ্গী ও অধীন লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা এই সকল নিরীহ প্রাণীগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া এখনই পদ্মার পর-পারে যাও, আমরা এখন এই স্থানেই থাকিব।"

অধীন লোকগুলি কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই কথায় বিস্মিত হইল! কোথায়, ঐ সকল ছাগ, মেষ ও মহিষ মহাসমারোহের সহিত দুর্গাদেবীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইবে এবং তাহারাও সকলে এই উৎসবের ভাগীদার হইবে! আর কোথায় কর্ত্তার পুত্রদ্বয়ের অকস্মাৎ এই দুর্ম্মতির উদয়! ইঁহারা কি শেষকালে ঐ দুই মায়াবী বৈষ্ণবের কথায় পড়িয়া পাগল হইলেন? ঐ দুই ব্যক্তি কি কোন যাদুমন্ত্র জানেন? দুর্গা-পূজার বলিগুলিকে এইরূপে ছাড়িয়া দেওয়া ত' মহা-পাপের কার্য্য! কর্ত্তা এই কথা জানিতে পারিলে ত' তাঁহার এই পুত্র-দুইটিকে ও তৎসঙ্গে

তাঁহাদের অনুচরদিগকে নিশ্চয় ভীষণ শাস্তি দান করিবেন; লোকেই বা কি বলিবে? এই সকল দ্রব্যের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং ও পুরোহিতগণ অপেক্ষা করিতেছেন। পূজার সময় এই সকল জিনিষ উপস্থিত না হইলে পূজাই বা কি করিয়া হইবে? সবই যে লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাইবে! যখন শিবানন্দের ভৃত্যগণ এইরূপ নানা কথা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল, তখন হরিরাম উহাদিগের কোনও কথা না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছাগ, মেষ ও মহিষগুলিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। তখন বাধ্য হইয়া সকলে ঐগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া পদ্মার ওপারে চলিয়া গেল।

এদিকে হরিরাম ও রামকৃষ্ণের আর্ত্তি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা গুরু-কৃপা-লাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরম দৈন্যার্ত্তিভরে তাঁহাদের চক্ষু দিয়া দরদর-ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। তখন ঠাকুর-মহাশয় ও কবিরাজ মহাশয় ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়কে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান করিলেন। পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া তাঁহারা ঐ দুই ব্রাহ্মণ-কুমারকে সঙ্গে লইয়া খেতুরীতে ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজ-মোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধামোহন—এই ছয় বিগ্রহ শোভা পাইতেছিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর দর্শনমাত্রই তাঁহার কৃপা বরণ করা কর্ত্তব্য, ইহাতে ক্ষণকালও বিলম্ব করা উচিত নহে—

ইহা জানিয়া সেই দিনই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট শ্রীহরিরাম এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনরোত্তমকে একই তত্ত্ব বিচার অর্থাৎ উভয়কেই তাঁহারা গুরু-বুদ্ধি করিলেন, কোন ভেদ-দর্শন করিলেন না। দুই মহাভাগবতের শক্তি-সঞ্চারে ও তাঁহাদিগের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ় শ্রদ্ধালু হইলেন।

বিজয়া-দশমীর পর একাদশীর দিন হরিরাম ও রামকৃষ্ণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া খেতুরী হইতে গোঁয়াস-গ্রামে আসিয়া বলরাম কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রিতে বলরাম কবিরাজের গৃহে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইল। শিবানন্দ পুত্র-দুইটিকে দেখিয়াই অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের যখন বৈষ্ণববেশ দেখিলেন, তখন ক্রোধে অধীর হইয়া শত-শত লোককে শুনাইয়া পুত্রদ্বয়কে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন,—"মূর্খ! কুলাঙ্গার! তোরা দুই-জন উচ্চকুলে কালি দিবার জন্যই আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি! তোরা পিতৃপুরুষের নাক-কাণ কাটিলি! তোদের দেখিলে সচেল গঙ্গাস্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তোরা অহিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম; কিন্তু

তোরা ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ছাড়িয়া যে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিস্,—এরূপ মূর্খতা, পাষণ্ডতা ও ভণ্ডামি কিছুতেই সহ্য হয় না! মূর্খ! তোরা কোথায় শুনিয়াছিস্ যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব বড়? ব্রহ্মময়ী মা এতদিনে তোদের সমুচিত শাস্তি দিলেন। তোরা কপটতা করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি। ভগবতীর আরাধনা ব্যতীত এই মানব-জীবনই বৃথা। পূজার বলি হইতে ভগবতীকে বঞ্চিত করায় তোরাই বঞ্চক বৈষ্ণবের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছিস্। এরূপ বৈষ্ণব ত' কখনও দেখি নাই যে ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিতে যায়! পণ্ডিত-সমাজের দ্বারা তোদের গুরুর দর্প শীঘ্রই বিনাশ করিব! দেখি, তাঁ'দের কতটা পাণ্ডিত্য আছে! ভবানীর কৃপায় তোদের গুরু কিরূপ অপদস্থ হয়, তাহা দেখিতে পাইবি। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। তোদের উপাস্য কৃষ্ণ ও চৈতন্য ব্রাহ্মণের কিরূপ সম্মান করিয়াছেন! কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণের কত পূজা করিয়াছেন! তোদের চৈতন্য ব্রাহ্মণের পদধৌতজল পান করিয়াছেন!' আর তোদের গুরু সেই ব্রাহ্মণভক্ত কৃষ্ণ ও চৈতন্যের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণকেই শিষ্য করিয়াছে! এত বড় ভণ্ডামি পণ্ডিত-সমাজের বিচারের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবই। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকে, শাক্তেরা বলি দিয়া জীব হত্যা করে; কিন্তু তোদের বৈষ্ণবেরা যে, লাউ-কুমড়ার ডগাগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া ঐগুলি দিয়া মহোৎসব করে, উহাতে কি জীব-হত্যা হয় না? বৈষ্ণবদের আবার কি শাস্ত্র আছে? উহারা কেবল ভাবকেলি জানে,

উহাদের ধর্ম্ম ত' সে-দিনকার ও অবৈদিক-ধর্ম্ম, আর ব্রহ্মণ্যধর্ম্মই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম,—বৈদিক ধর্ম্ম !"

শিবানন্দের কথা শুনিয়া হরিরাম অতিশয় তেজ উদ্দীপ্ত-বাক্যে বলিলেন,—"আপনি পণ্ডিতগণকে আনিয়া আমাদের গুরুবর্গকে পরাভূত করিবেন, বলিতেছেন। আমি বলি, আগে আমার সহিতই ঐ পণ্ডিতদের তর্ক-বিচার হউক। আপনি যত ইচ্ছা বড় বড় পণ্ডিত লইয়া আসুন। যদি তাঁহারা আমাকে শাস্ত্র-বিচারে পরাভূত করিতে পারে, তবেই আপনার কথা স্বীকার করিব; নতুবা আপনার কথাগুলি কেবল ভেকের কোলাহলের মতই জানিব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া শিবানন্দ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মূর্খ! কুলাঙ্গার! আমার কথাগুলিকে ভেক-কোলাহল বলিতেছিস্! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে! পিতা বলিয়াও তোর বুদ্ধি নাই! পূর্ব্বের বৈষ্ণবগণ 'তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা দিতেন; আর তোদের গুরু দাম্ভিকতা ও পিতৃদ্রোহ শিক্ষা দিয়াছে!"

শিবানন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া অবিলম্বে কতিপয় মহা-মহোপাধ্যায় প্রবীণ পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। বড় বড় পণ্ডিত আসিয়া হরিরামের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন। বয়সে হরিরাম কনিষ্ঠ হইলেও সিংহের মত হুঙ্কার করিয়া পণ্ডিতগণের সমস্ত অভক্তি-মতবাদ খণ্ডন-পূর্ব্বক সর্ব্বোপরি শুদ্ধভক্তির মহত্ত্ব স্থাপন করিলেন। বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও

পুরাণের প্রমাণের দ্বারা দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ,—বৈষ্ণবের দাসত্ব করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হয় ; নতুবা ব্রাহ্মণ 'পতিত' হইয়া যায়। হরিরাম বিচার ও বহু শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবদিগের ভগবদারাধন নির্গুণ ও তাহা অহৈতুক ; কিন্তু কামনা-মূলে যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার আরাধনা, তাহা গুণের অন্তর্গত অর্থাৎ মিশ্র-সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক। ভগবদ্ভক্তগণ সকল-কার্য্য ও সকল-চেষ্টাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের কোন কার্য্যেই হিংসা হয় না। বৈষ্ণবগণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামী নহেন। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শরণাগতকে কৃষ্ণই সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করেন। কৃষ্ণে শরণাগত বৈষ্ণবকে পঞ্চসূনা-পাপ, দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিত্রাদির পঞ্চ ঋণ বা অন্যান্য দেবতার পূজকগণের ন্যায় জীব-হত্যাদি পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

হরিরামের এইরূপ শাস্ত্রযুক্তিমূলক অকাট্য সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইলেন ও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"ইঁহাকে আমরা সামান্য বালকরূপে দেখিয়াছি ! এত অল্প-বয়সে শিবানন্দের পুত্র কিরূপে এরূপ শাস্ত্র-জ্ঞান অর্জ্জন করিল ! শিবানন্দের এই দুই পুত্র নিশ্চয়ই সরস্বতীর বর লাভ করিয়াছে ! নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের শক্তিতেই ইহাদের এরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদিগকে

পরাজিত করিতে পারে—এরূপ পণ্ডিত কোথায়ও আছেন বলিয়া মনে হয় না।”

কোথায় শিবানন্দ পুত্রদ্বয়কে পণ্ডিতগণের দ্বারা পরাজিত করাইবেন, আর কোথায় উহার বিপরীত ফল ফলিল! পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত ও নিরুত্তর হইয়া অতি নম্রভাবে স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাতে শিবানন্দের ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এবার এক অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আনাইয়া দাম্ভিক পুত্রদ্বয়ের গর্ব্ব নিশ্চয়ই খর্ব্ব করিবেন। শিবানন্দ উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া মিথিলা হইতে দিগ্বিজয়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিত মুরারিকে স্ব-গ্রামে আনয়ন করিলেন। মুরারি তাঁহার বহু শিষ্যের সহিত উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মুরারি যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন; পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে যে-কোন ব্যক্তিকে তৃণ জ্ঞান করিতেন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার নিকট শিবানন্দের যুবক পুত্রদ্বয় যে তৃণাপেক্ষাও লঘু বলিয়া বোধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হরিরাম ও রামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিবামাত্র মুরারি বলিলেন,—“এই বালকদিগের সহিত বিচার করিতে যাওয়া আমার পক্ষে লজ্জাজনক। যদি তাঁহাদের গুরু অথবা তাঁহাদের দলের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমার সহিত তর্কযুদ্ধে উপস্থিত হন, তবে আমি তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত আছি; নতুবা, মশা মারিবার জন্য আমি কামান দাগিব না।” তখন প্রবীণ বলরাম কবিরাজ দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার করিবার জন্য তাঁহার

নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কবিরাজকে আর অধিক বিচার করিতে হইল না। কবিরাজ দিগ্বিজয়ী মুরারির বাক্যের দ্বারাই তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

মুরারির একটি গুণ ছিল এই যে, পরাভূত হইলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিতে কপটতা বা পরাজয়কে জয় বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য অন্যায় গোঁড়ামি করিতেন না। পণ্ডিত পরাজিত হইয়া বলিলেন,—"বৈষ্ণবের মহিমা বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই; বৈষ্ণব হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই।"

মুরারি তাঁহার যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী সকলকে বিতরণ করিয়া দিলেন। দেশে ফিরিয়া আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না বিচার করিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তে ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন। তখন পূর্ব্বের পাণ্ডিত্যাভিমানকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া মনের খেদে ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করায় তাঁহার অবলম্বিত পথ "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" বলিয়া বিখ্যাত হইল. অর্থাৎ না রহিলেন তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, না হইলেন তিনি একান্ত বৈষ্ণব; তিনি একটি তৃতীয় পথ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য দুঃখ ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করায় ভগবতী তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডদান করিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই আখ্যানটি বলিয়া বৈষ্ণব-সদ্গুরুর-দর্শন-মাত্রেই তাঁহার

পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার আবশ্যকতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া জগতের গণগড্ডলিকা যে-সকল ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা সকলই সকাম ও সগুণ; কিন্তু প্রত্যেক জীবেরই চেতনের চরম প্রয়োজন —ভগবৎপ্রেম। সেই প্রেমধর্ম্মই প্রকৃত সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক-ধর্ম্ম। এই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে ঐসকল অন্যাভিলাষময় ধর্ম্মের আশ্রয় অবিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উহাতে কোনও প্রকার লৌকিক, স্যমাজিক বা তথা-কথিত নৈতিক প্রতিবন্ধক আনিয়া শুদ্ধভক্তির পথকে আচ্ছাদন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। মাতা-পিতা বা লৌকিক-গুরুবর্গ যদি হরিভজনের বিঘ্ন প্রদান বা গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রথমে বিনীত ভাবে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে হইবে; কিন্তু যদি তাহাতে তাঁহারা ভক্তি-পথের বিদ্বেষই করেন, তবে তাঁহাদের সঙ্গও দুসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রভুর প্রভু, সকল পূজনীয়গণের নিত্যপূজনীয় শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের অকপট সেবাই করিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ এই—

সকল জনমে পিতা, মাতা সবে পায়
কৃষ্ণ, গুরু নাহি মিলে, বুঝিহ হিয়ায়॥

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মঃ খঃ

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্‌ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।১৮

দম্ভদৈত্য ও দীনতা-দেবী

ঠাকুর নরোত্তম শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিবার পর শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথাচার্য্য প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় করিলেন। সেই সময় বঙ্গদেশে 'নরসিংহ'-নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা নরসিংহকে জানাইলেন, "কৃষ্ণানন্দ-দত্তের পুত্র নরোত্তমদাস বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই ব্যক্তি কি জানি কি কুহক জানে! তাই অনায়াসে ব্রাহ্মণগণ দলে-দলে আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতেছেন। লোকে তাহাকে শাস্ত্রবিৎ বলিয়া থাকে; কিন্তু ঐ ব্যক্তি কেবলমাত্র মূর্খদিগের নিকট বৃথা অহঙ্কার করিয়া 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে

সে দম্ভস্ফুট করিতে পারে না। মহারাজ! আপনি আমাদিগকে অবিলম্বে তাহার নিকট লইয়া চলুন; দেখিবেন, আমাদের ভয়ে তাহার কি অবস্থা হয়। সে-ব্যক্তি তাহার ভাবকেলি লইয়া তখনই পলাইবে। সকল-দেশে তখন আপনার সুখ্যাতি হইবে। আর আপনার দ্বারা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাও স্থাপিত হইবে। রাজার কার্য্যই দণ্ড-বিধান। যদি আপনি ব্রাহ্মণ-জাতির প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও অসম্মানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-জাতিটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।”

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাসদ্‌গণের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া রাজা নরসিংহ ঠাকুর নরোত্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অধ্যাপক-গণ রাশি-রাশি পুস্তক লইয়া অহঙ্কার করিতে করিতে উল্লাসভরে চলিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা নরসিংহ এই যুদ্ধ-যাত্রার অধি-নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন এবং দেশবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-নারায়ণকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন। খেতুরীর নিকট ‘কুমারপুর’ নামে এক গ্রামে রাজা নরসিংহ—তাঁহার অধ্যাপক-মণ্ডলী ও সৈন্য-সামন্ত-সহ শিবির স্থাপন করিলেন। এই কথা লোক-পরম্পরায় শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার অভিন্নাত্মা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট একান্তে বলিলেন,—“ভগবদ্ভক্তিহীন অধ্যাপকগণের সহিত তর্ক করিতে হইবে,—ইহাতে ভজনের বিঘ্ন হইবে, মনে করি; কারণ, ইহারা সচ্ছাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না, তাহাদের অহমিকাকেই প্রবল রাখিবে।” শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ বলিলেন,—

"আপনি নিশ্চিন্তে ভজন করুন। দেখিবেন, অনায়াসেই ঐসকল দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ হইবে এবং অবশেষে আপনার শ্রীচরণে আসিয়া তাহারা শরণাগত হইবে।"

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ মহাশয় গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সহিত এক যুক্তি করিয়া দুইজনে কুমারপুর গ্রামের অভিমুখে চলিলেন। পথে রামচন্দ্র-কবিরাজ পানবিক্রেতা 'বারুজীবী' ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী হাঁড়ি-কলস-বিক্রয়কারী কুম্ভকারের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া মস্তকের উপর কিছু পানের বিড়া ও হাঁড়ি-কলস লইয়া কুমারপুরে প্রবেশ করিলেন এবং দুই জনই বাজারে দোকান পাতিয়া বসিলেন। তথায় রাজা নরসিংহের সহিত আগত অধ্যাপকের এক ছাত্র তাঁহার অধ্যাপকের জন্য পান কিনিতে আসিয়াছিল। ছদ্মবেশী বারুইকে সাধারণ পান-বিক্রেতা জানিয়া ছাত্রটি গ্রাম্য বাঙ্গালা-ভাষায় পানের দর জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পান-বিক্রেতা অতি শুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় উহার উত্তর দিতেছেন দেখিয়া ছাত্রটি অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তখন ছাত্রটিও অহঙ্কারের সহিত সংস্কৃত-ভাষায় প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল; কিন্তু ছদ্মবেশী পান-বিক্রেতার সহিত কথায় পারিয়া উঠিল না,—সংস্কৃতে দুই চারিটি কথা বলিবার পরেই পরাভূত হইল। ছাত্রটির মুখে যেন চূণকালি পড়িল। ছদ্মবেশী পান-বিক্রেতা ছাত্রটিকে বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত মূর্খ, তুমি আর কতটুকু জান? তোমার অধ্যাপককে লইয়া আইস, দেখিতে পাইবে—তাঁহারই বা বিদ্যাবুদ্ধি কতটুকু আছে?"

ছাত্রটি ক্ষোভে ও লজ্জায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই কথা অধ্যাপকের নিকট গিয়া জানাইল—"হায়! হায়! একটি সামান্য পান-বিক্রেতার নিকট আজ আমাকে পরাজিত হইতে হইল! আমি কিরূপে আর লোকের নিকট মুখ দেখাইব?" এইরূপে সে খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। "যে খেতুরী গ্রামে শ্রীনরোত্তম অবস্থান করেন, সেই গ্রামের পান-বিক্রেতা ও হাঁড়ি-কলস-বিক্রেতা-পর্য্যন্ত যখন এইরূপ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তখন শ্রীনরোত্তমের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ আর কিরূপে করা যাইবে? যদি আপনারা ঐ বারুজীবীর ছেলেটিকে জয় করিতে পারেন, তবেই খেতুরীতে শ্রীনরোত্তমের সহিত তর্ক করিতে প্রবেশ করুন; নতুবা এখান হইতে এখনই ঘরে ফিরিয়া চলুন।"

এই কথা শুনিয়া ছাত্রটির অধ্যাপক ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন,—"দেখি, কোথায় বারুইর ছেলে আছে? আমি তাহাকে খুব ভালরূপে শিক্ষা দান করিব।" ছাত্রটির সহিত অধ্যাপক সেই পান-বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত-ভাষায় তর্ক আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে-ক্রমে শাস্ত্র-বিচার আরম্ভ হইল। অন্যান্য অধ্যাপকগণও তথায় আসিয়া পড়িলেন। রাজা নরসিংহও দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত রূপনারায়ণের সহিত তথায় আসিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকের অত্যন্ত ভিড় হইল। বাজারের মধ্যে উভয় পক্ষের এক ভীষণ শাস্ত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পান-বিক্রেতা সুমধুর ও সুযুক্তি-পূর্ণ শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা রাজ-পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে অধ্যাপকগণ সর্ব্বতোভাবে পরাজিত ও

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অধ্যাপকগণকে লইয়া রাজা শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল,—"অধ্যাপকগণ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শাস্ত্র-যুদ্ধে পরাভূত হইবার পর যেন কুকুরের ন্যায় লেজ গুটাইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা মূর্খ, ঠাকুর-মহাশয়ের মহিমা ইঁহারা আর কি জানিবেন? স্বয়ং পার্ব্বতীদেবী ব্রাহ্মণগণকে ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য হইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চরণে অপরাধ করিলে আর নিস্তার নাই।" লোক-পরম্পরায় এইসকল কথা রাজা নরসিংহেরও কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি পণ্ডিত রূপনারায়ণকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাই, এখন কি উপায় হইবে, স্থির কর; আমাদের পণ্ডিতগণ ত' খুব অহঙ্কার করিয়াছিলেন যে, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুরকে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ ও মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন! এখন ত' তাঁহাদিগকেই ঠাকুর-মহাশয়ের গ্রামের বারুই, কুমার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরাজিত হইতে হইল! ইহাতে যে কেবল পণ্ডিতগণ অপমানিত হইয়াছেন, তাহা নহে; আমারও মাথা কাটা গিয়াছে।" পণ্ডিত রূপনারায়ণ তখন রাজা নরসিংহকে বলিলেন,—"বাস্তবিকই বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর আর ধর্ম্ম নাই। বৈষ্ণবের নিন্দার ন্যায় আর অপরাধও নাই। এখন আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য খেতুরীতে গমন করিয়া ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের

আর অন্য কোন উপায় নাই। আগামী কল্যই সকলকে লইয়া আমাদের খেতুরীতে গমন করা উচিত।"

অধ্যাপকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা না পারেন রাজাকে মুখ দেখাইতে, না পারেন দেশে যাইতে। তাঁহারা যেন মৃতপ্রায় হইয়া অন্য দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র-কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের পান ও হাঁড়ি-কলস দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া অত্যন্ত আনন্দভরে খেতুরীগ্রামে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

রাজা নরসিংহ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কৃপা-লাভের জন্য এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কেবল পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—তাহার ন্যায় দুর্জ্জন অপরাধী ব্যক্তিকে কি ঠাকুর-মহাশয় কৃপা করিবেন?

এদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিক ছিলেন, তিনি রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, ভগবতী দেবী হস্তে খড়্গ লইয়া ক্রোধভরে উক্ত অহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন,—"ওহে দুষ্টমতি! তোর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সকলই বৃথা। তুই বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছিস্। তোর মুণ্ড যদি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারি, তবেই আমার মনের দুঃখ মিটিবে। ওরে দুষ্ট অসুর! ইহা ছাড়া আর তোকে কি দিয়া শিক্ষা দিব? যদি তুই রক্ষা পাইতে চাহিস্, তাহা হইলে ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর্।” নিদ্রা-ভঙ্গ হইবা-মাত্র অধ্যাপক ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং সকলকে জাগাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভাত হইবা-মাত্রই তিনি রাজার নিকট গিয়া এই সকল কথা জানাইলেন। রাজা সকলকে স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। রাজা নরসিংহ বিনা যানে অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া অতি দীনবেশে ও বিনীতভাবে খেতুরীতে ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় তৎকালে নিভৃতে ভজন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র-কবিরাজ প্রভৃতি রাজাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং পরে রাজা নরসিংহকে ও পণ্ডিত রূপনারায়ণকে তিনি ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বিষয়ী ও অপরাধী বলিয়া জানাইলেন এবং ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ অপরাধের কথা জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অহঙ্কারী অধ্যাপকটিকে ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট আনিয়া তাঁহার প্রতি ভগবতী-দেবীর আদেশের কথা নিবেদন করিলেন এবং ইঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। অদোষ-দর্শী শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সেই অধ্যাপক-ব্রাহ্মণকে কৃপা-পূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-পূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীচরণ-ধূলিতে ধূসরিত হইলেন।

সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অঙ্গনে মহা-সংকীর্ত্তন ও রাজভোগ প্রদত্ত হইল। শ্রীসন্তোষ রায় (ঠাকুর-মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃব্য-পুত্র, ভ্রাতা ও শিষ্য) রাজা নরসিংহ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। সকলে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিলেন। পরদিন শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় মন্ত্র-দীক্ষা দান করিয়া সকলকে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিলেন। সকলে গঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ দেশে গমন করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ-যাত্রায় রাজা নরসিংহের সহিত আগতা তদীয় মহিষী শ্রীরূপমালাদেবীকে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় মন্ত্র-দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীরূপমালা প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ করিয়া লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কৃপায় সকলেই বৈষ্ণব হইলেন।